Vol. 47 | No. 3 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সমরেশ বসুর গঙ্গা : মাছমারাদের জীবনকাহিনী

Volume	47
Issue	3
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Gias Shamim
Published online	June 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i3.2
Pages	24-52
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সমরেশ বসুর গঙ্গা : মাছমারাদের

Check for updates

গিয়াস শামীম*

গঙ্গা[১] সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত উপন্যাস। *পদ্মানদীর মাঝির* (১৯৩৬) রোমান্টিক ভাবপ্রবণতা আর *তিতাস একটি নদীর নামের* (১৯৫৬) কবিত্বময় নির্লিপ্তির সমান্তরালে *গঙ্গা* যুক্ত করেছে নদীজীবনের আরেক তরঙ্গসঙ্কুল মাত্রা। এ-উপন্যাসে মানবজীবনপ্রবাহের সঙ্গে নদীজীবনের যোগ অবিচ্ছেদ্য গঙ্গাতীরবর্তী আতপুরের তরফদারপাড়ায়[২] বসবাসকালে কেবল গঙ্গা[৩] নদীই নয়, এতদঞ্চলের 'মাছমারা'[৪]দের সঙ্গেও তাঁর গড়ে উঠেছিল নিবিড় জানাজানির সম্পর্ক প্রথম উপন্যাস *উত্তরঙ্গে* (১৯৫১) গঙ্গার উভয়তীরবর্তী ভূমিখণ্ডের পরিশ্রমজীবী মানুষের জীবনবাস্তবতা অঙ্কনের প্রায় অর্ধযুগ ব্যবধানে তিনি উপন্যাসের পটপরিসররূপে অবলম্বন করলেন সেই গঙ্গাকেই, যে-গঙ্গা মানবজীবনের মতোই নিয়ত বহমান। গঙ্গা এবং গঙ্গানির্ভর মাছমারাদের সংগ্রামী জীবনের প্রতি কৌতূহলই শুধু নয়, সম্ভবত কবি বিষ্ণু দে-র একটি উক্তিও[৫] সমরেশ বসুকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে *গঙ্গা* উপন্যাস রচনায়, এবং তাঁর শিল্পানুষঙ্গে যুক্ত করেছে জীবনোপলব্ধির নবতর রস-রসায়ন। কেবল জীবনশিল্পী নন, জীবনশিকারিরূপেই তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করেছেন *গঙ্গায়*।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) কাছে যেমন পদ্মা, তেমনি সমরেশ বসুর কাছে গঙ্গা হচ্ছে তাঁর প্রাণসত্তার প্রতীক; সত্যিকার প্রেরণাদর্শ। *গঙ্গা* উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবনাবেগ ও শিল্পবোধের ঘটেছে প্রথম বিস্ময়কর উদ্বোধন। 'যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত অভিজ্ঞতায় অভিনব উপন্যাসগুলির বিপুলতার দিকে তাকিয়ে এ কথা বলতে হয় যে, 'গঙ্গা'র ঔপন্যাসিক দৃঢ়তা এ জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র সিদ্ধির ধ্রুব আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমরেশকে।'[৬] এ-উপন্যাসে মাছমারাদের জীবনযুদ্ধের দৃশ্যায়িত চলচ্ছবিগুলি তাঁর অসামান্য জীবনান্বেষণ, জীবনদর্শন এবং জীবনসমীক্ষারই নিটোল ও অনবদ্য শিল্প-সংস্করণ। গঙ্গাতীরবর্তী ধীবর-জনশ্রেণীর রোমাঞ্চকর মৎস্য-শিকার-অভিযানের বর্ণনানুষঙ্গে উপন্যাসটি প্রকৃতই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত

ধলতিতা গ্রামের পঞ্চানন মালোর মগ্নচৈতন্য-উৎসারিত ভাবনালোকের অনুষঙ্গী হয়েই *গঙ্গা* উপন্যাসের জীবন-পটের উন্মোচন। বর্ষার আবির্ভাবে দক্ষিণবাহিনী গঙ্গায় মৎস্য-শিকারের জন্য কাছের এবং দূরের মাছমারাদের সঙ্গে ধলতিতা থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র বিলাসকে নিয়ে গঙ্গায় এসেছে পঞ্চানন বা পাঁচু। এক সময় সে গঙ্গায় মৎস্য-শিকারের জন্য আসত তার অগ্রজ নিবারণ দাস মালোর সঙ্গে। নিবারণ ছিল চৌকস ধীবর-সর্দার; লোকে বলত সাইদার নিবারণ। মাছের মরশুমে আটঘাট বেঁধে 'দশ-বিশ গণ্ডা জেলে-

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মালো জুটিয়ে, ত্রিশ চল্লিশটি নৌকা আর পঞ্চাশ-ষাটটি জাল নিয়ে' নিবারণ সমুদ্রযাত্রা করত অবশেষে একদিন সমুদ্র-মোহানায় অসীম সাহসী নিবারণ সাইদারের মৃত্যু হলে তার পরিবার ঘোর অনিশ্চয়তায় নিক্ষিপ্ত হয়। জীবনধারণের প্রয়োজনে তার অনুজ পাঁচু গঙ্গাবক্ষে অভিযান চালায় বিলাসকে নিয়ে এই অভিযানকালে গঙ্গাবক্ষে সংঘটিত বাস্তব ঘটনারাশির সঙ্গে পাঁচুর স্মৃতি ও শ্রুতিনির্ভর ভাবনাপুঞ্জের সমবায়ে নির্মিত হয়েছে *গঙ্গা* উপন্যাসের গল্পাংশ। এ-গল্পাংশের পরিণতিতে বিলাসের সদর্প আত্মপ্রকাশ ঘটে নিবারণ সাইদারের সার্থক উত্তরসূরিরূপে সে উপস্থিত হয় দৃশ্যপটে; বীর্যবান সাহসী ধীবরের প্রতিচ্ছবি উৎকীর্ণ হয় তার দ্রাবিড়ীয় অবয়বে। সে গঙ্গাবক্ষ ছাড়িয়ে সমুদ্রসন্দর্শনের রোমাঞ্চকর অভিযানের সঙ্কল্পে জাগ্রত হয়।

গঙ্গা উপন্যাসের গল্পাংশ এবং পট-পরিবেশ-অন্তর্গত চরিত্রপাত্রের জীবনচর্যা পর্যবেক্ষণসূত্রে বলা যায়, এটি গঙ্গানির্ভর জনজীবনেরই বিশ্বস্ত প্রতিরূপ। মাছমারাদের বাঁচা-মরার আকাঁড়া বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। 'একটি বিশেষ অঞ্চলের মৎস্যজীবীসম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার এরূপ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ও অন্তর্গূঢ় প্রেরণা বাংলা উপন্যাসে অন্যত্র দুর্লভ।'[৭] উপন্যাসের সূচনা-পর্যায়ে গঙ্গাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পূর্ব, পূর্ব-দক্ষিণ এবং পূর্ব-উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসা অনতিদূর গ্রামাঞ্চলের মৎস্যজীবী মানুষের যে বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে, তাতে প্রকটিত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবন-পরিবেশের local color বা স্থানিক বর্ণিমা। ধলতিতা, তেঁতুলিয়া, সারাপুল, পুরোখোঁড়গাছি, ফতুল্লোপুর, ফরিদকাঠি, বীরপুর, পুঁড়্যা, আতুড়ে, ইটিণ্ডে, দণ্ডিরহাট, শাঁখচুড়া, টাকি প্রভৃতি গ্রামের জেলে, কৈবর্ত, নিকিরি, চুনুরি, মালা সবাই এসেছে জীবনের দাবিতে, গঙ্গাকে উপলক্ষ করে। গঙ্গাবক্ষে পড়ে গেছে জীবনের সাড়া। গোপালপুর, সন্দেশখালি, হাসনাবাদ, ইছামতী, মঠবাড়ি, দুলদুলি, সাহেবখালি, ঝিল্লে, রাইমঙ্গল, শুলকুনি, ভবানীপুর, কালীনগর প্রভৃতি নদনদী-খাল-বিল-জনপদ অতিক্রম করে সবাই আসছে গঙ্গায়। এদের উপস্থিতি গঙ্গা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলকে প্রদান করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা।

সমরেশ বসু *গঙ্গা* উপন্যাসে পাঁচুর মগ্নচৈতন্য-উৎসারিত ভাবনাপ্রবাহ উপস্থাপনসূত্রে মাছমারাদের জীবনযাপনের সম্পন্ন চিত্র অঙ্কন করেছেন। অর্থনৈতিক শ্রেণিবিচারে এই মাছমারারা একেবারেই হতশ্রীদশাগ্রস্ত, সহায়-সম্বলহীন, অসহায়। তাদের ভাগ্য ফড়িয়া-মহাজনদের ইচ্ছানির্ভর। ঋণের দায়ে তাদের নৌকা বন্ধক থাকে মহাজনের কাছে। তোয়াজ-তোষামোদের মাধ্যমে মহাজনকে তুষ্ট করে তারা এক পর্যায়ে নৌকা ফিরে পায়, এবং যাত্রা করে মাছমারা-উৎসবে।

প্রতি বছরই মাছমারারা নতুন আশায় বুক বাঁধে। তাদের বিশ্বাস, অতিদ্রুত তাদের জীবনে সচ্ছলতা আসবে, মহাজনের ধার-দেনা পরিশোধ করে নবতর আঙ্গিকে জীবন শুরু করবে; জীবনক্ষেত্র থেকে অপসৃত হবে দুঃখদৈন্য। কিন্তু তাদের কোনো প্রত্যাশাই চরিতার্থতার সন্ধান পায় না; ভাগ্যের চাকা অনড় থাকে পূর্ববৎ। তবু গঙ্গাই তাদের

অকৃত্রিম আশ্রয় তাই তার টান অগ্রাহ্য করা তাদের পক্ষে অসম্ভব পাঁচুর অন্তর্ভাবনা-উৎসারিত বক্তব্যেও রয়েছে তার স্বীকৃতি :

> তবু আসতে হবে। যার নৌকা নেই, মহাজনের কাছ থেকে নৌকা ভাড়া নিয়েও সে আসবে। এ মিঠে জলের টান, বড় টান। যদি দেয় তো, গঙ্গাই দেবে হাত ভরে। না দিলে মরণ।
>
> তাই সবাই আসছে এদিকে। উত্তর-দক্ষিণ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নৌকা আসছে, আসবে। পুবের আরও উঁচু, সেই গাঁয়ের লোকেরা যাবে ইছামতী দিয়ে, যাবে সেই গোপালনগর, মোল্লাহাট, গরিবপুরের পাশ দিয়ে। ইছামতী থেকে পড়বে খালে। খাল দিয়ে চুর্ণী নদীতে। রানাঘাটের সীমানায়।...
>
> কিন্তু আসতে হবে। যেদিক দিয়েই হোক। যদি মাছমারা হও, তবে মাছের পিছে পিছে আসতে হবে।[৮]

গঙ্গাই মাছমারাদের জীবন-জীবিকার প্রধান সহায় এজন্য পরিবার-পরিজনের মমতা উপেক্ষা করে মাছমারারা জীবনরক্ষা ও জীবিকার্জনের তাগিদে প্রতি বছর গঙ্গাবক্ষে পাড়ি জমায়। তবু কষ্টই তাদের একমাত্র বিধিলিপি এ-কষ্টের পরিধি দ্রৌপদীর শাড়ির মতোই আদি-অন্তহীন অভাব-আকালের সঙ্গেই তাই তাদের নিত্য পরিচয় :

> মাছমারার ঘরে কয়েক টোটার এক টোটা হল চোত-টোটা। অর্থাৎ চৈত্রের মন্বন্তর। যাকে বলে, চোত-পোড়া। এর আগে যায় পোষ-পোড়া। পোড়ার অভাব নেই। ফাল্গুনেও কিছু সুদিন আসে না।[৯]

যে-গঙ্গার ওপর মাছমারাদের অকৃত্রিম নির্ভরতা, সে-গঙ্গায়ও জীবনযাপন নিষ্কণ্টক নয়। সেখানে রয়েছে জলদস্যুর উপদ্রব; যারা সুযোগ বুঝে লুণ্ঠন করে মাছমারাদের সর্বস্ব। এজন্য মাছমারারা গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে পরস্পরের পাশাপাশি অবস্থান করে। এছাড়া তাদের উপায়ও নেই কারণ জলদস্যুর উপদ্রব ছাড়াও দলবিচ্ছিন্ন নৌকা যে-কোনো সময় প্রবল ভাটার টানে হারিয়ে যেতে পারে দূর সমুদ্রে :

> নৌকার হাট। অর্থাৎ শাবর। তখন ভাটার টান। গায়ে গায়ে সব নৌকা। এক-আধ হাতের ফারাক আছে। রাখতে হয়। প্রাকৃত কাজকর্ম সারবার জন্যে একটু ফাঁকা-ফারাক দরকার। ভাটার টানও বড় টান। বড় সাবধানে রাখতে হয় নৌকা। একটিও যদি ফাঁক পেয়ে ভাটার টানে ভাসে, তবে একেবারে সাগরে। আর ফিরবে না। এমনও কত গেছে। ...
>
> তারপর আবার জোয়ারের মুখে হয়তো দেখা যায়, নৌকা এসেছে ফিরে।... ছই আছে কি নেই। জিনিসপত্র নেই, মানুষও নেই। নেই। চোখের সামনে সমুদ্রের জল এক পলকের জন্য লাল হয়ে ওঠে, আর টুকরো টুকরো মাংস, জ্যান্ত মানুষের।[১০]

তবু মৃত্যুভয় নেই মাছমারাদের। কারণ, মরণ এবং মারণ হচ্ছে তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তাদের দিনরাত্রি অতিবাহিত হয় গঙ্গাবক্ষে। যখন তাবৎ সংসার নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে, তখনও নদীবক্ষে তারা জেগে থাকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো। এভাবে 'বর্ষার মরশুম যায় চার মাস। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন। মাছমারা তখন অমাবস্যা-

পূর্ণিমার, জোয়ার-ভাটার গোন-কোটালের পিছে পিছে ভেসে বেড়ায় গাঙে-নদীতে [১১] ওদিকে পুরুষহীন একলা ঘরে মাছমারার স্ত্রী নির্ঘুম-নিঝুম রাত কাটায় সে জানে না জীবননদীর কোন্ অকূলে ভেসে চলেছে তার স্বামী : স্বামীর অকল্যাণ হবে ভেবে সে বুকে চেপে রাখে দীর্ঘশ্বাস; আর কেবলই প্রতীক্ষার প্রহর গোণে। অন্তঃপুরবাসিনীদের দুঃসহ জীবনযাপনের এই চালচিত্র সমরেশ বসু অঙ্কন করেছেন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ-পর্বে রচিত 'বারমাস্যা'র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গলের* ফুল্লরার বারমাস্যা'র চেয়েও মাছমারাদের এ-বারমাস্যা অনেক বেশি করুণরসাত্মক অভাব-অনটনের সংসারে আর কিছু না থাকলেও ফুল্লরার জীবনে স্বামীর অস্তিত্ব ছিলো সর্বক্ষণিক অথচ মাছমারাদের স্ত্রীরা সে-সঙ্গসুখ থেকেও নির্মমভাবে বঞ্চিত জীবনের সর্ববিধ বঞ্চনাই ধলতিতা-বীরপুরের এ-নারীলক্ষীদের একমাত্র নিয়তি এ-বঞ্চনার চিত্র নিম্নরূপ :

> বর্ষার চার মাস কাটিয়ে যদি গাঙের মানুষ, চাকুন্দে মাকুন্দে হয়রার ফেরে কাটিয়ে আসে কার্তিক, তবে পাঁচ মাস। তারপর ঘরে ফেরে সে।
>
> তবু বউ জাগে ঘরে। উত্তরে বাতাস বয়। জলে ধরে টান। সমুদ্রে সাই যাওয়ার সময় হয়েছে। হাতে মাত্র কয়েকদিন।...
>
> বউ জাগে আবার। সতর্ক চক্ষু তার জাগে সমুদ্রে। নীলাম্বুধি অন্ধকারের বুকে, শাবরের আনাচে কানাচে, মাছের চকের পিছনে পিছনে, বনের অদৃশ্য দানোর সঙ্গে সঙ্গে, দক্ষিণ রায়ের পায়ে পায়ে, মা বনবিবির আঁচলে আঁচলে জাগে তার চোখ।...
>
> অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন। ফাল্গুন পড়তে না পড়তে আসে দখনে বাওড়। সমুদ্র মেতে ওঠে নিজের লীলায়। তার ফোঁসানি গর্জানি দেখে মরণ আসে দুহাত তুলে।
>
> মাছমারা ফিরে আসে। কিন্তু বউ জাগে। কেন, না, এর নাম চৈত্র মাস। কথায় বলে চৈত-টোটা। অর্থাৎ চৈত্র- মন্বন্তর।...
>
> তারপর বৈশাখে নতুন জল আসতে থাকে, জ্যৈষ্ঠে চলে প্রস্তুতি, আষাঢ়ে আসে অম্বুবাচী।...
>
> তুমি মাছমারার বউ, তুমি জাগো বারোমাস।
>
> এইটা নিয়ম।[১২]

অব্যাহত বঞ্চনাই মাছমারাদের বিধিলিপি তাদের শ্রমলব্ধ অর্থের প্রায় সবই গ্রাস করে মহাজন আর ইজারাদার অনন্তের সঙ্গে কথোপকথনসূত্রে পাঁচুর উক্তি লক্ষণীয় :

> ... এ বোশেখ চোত জষ্টি, বাওড়ে বিলে নদীতে যত মাছ ধরনু, তার পেরায় আদ্ধেকখানি তো রোজই মহাজনের কাছে গেল, ও সবের তো লেখাজোখা নেই। তারপর, বিল-বাওড়ের ইজারা যানাদের কাছে, তাদেরটাও মিটুতে হয়।[১৩]

ফড়ে-পাইকারদের ওপরও নির্ভর করে মাছমারাদের জীবনভাগ্য এ-নির্ভরতা বংশানুক্রমিক। চন্দননগরের ফড়েনি দামিনী প্রসঙ্গে পাঁচুর অন্তর্ভাবনা লক্ষণীয় :

> ঘরে বাইরে ঋণ দামিনীর কাছে। এখনও পঞ্চাশ টাকা ধারে পাঁচু। দাদা নিবারণও ঋণ করত দামিনীর কাছে। দামিনীর মায়ের কাছে ঋণ খেয়েছে পাঁচুর বাপ। সবটাই বংশপরম্পরায় চলছে।[১৪]

মাছমারাদের অন্তহীন চাহিদার সঙ্গে প্রাপ্তির ব্যবধান যখন উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে, সহায়-সম্বলহীন নিঃস্বতা যখন তাদের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের কেউ কেউ গ্রহণ করে ভিক্ষাবৃত্তি; কেউবা অবলম্বন করে চৌর্যবৃত্তি মাছের মৌসুম-শেষে গঙ্গা যখন কৃপণ হয়ে যায়, তখন তারা অন্যের জমা-নেওয়া পুকুরে-বাওড়ে-বিলে চুরি করে জাল ফেলে; পরিণামে পঞ্চায়েতের সামনে অপরাধ স্বীকার করতে হয়, দুঃখে কাঁদতে হয়, গুণতে হয় জরিমানা 'নিবারণের মতো মানুষ শেষ দিনকে সারাপুলের হাবরে যেত লুকিয়ে মাছ ধরতে।'[১৫] কখনো-কখনো হাবরে গিয়ে মাছমারারা ডেকে আনত করুণ পরিণতি। নির্মম মৃত্যুর কাছে হার মানত জীবনধারণের আকুতি। অভয় মালোর মৃত্যু-বর্ণনা প্রসঙ্গে এ-সত্য পরিস্ফুট করেছেন লেখক :

> হাবরের মাছ চুরি করতে গিয়ে প্রাণে মরেছিল অভয় মালো। সাপে কাটেনি। ডুবে মরেনি। কোন অন্ধকার থেকে ছুটে এসে এফোঁড় ওফোঁড় করেছিল একখানি মস্ত ধারালো ট্যাটা।
>
> শুধু তার হাতে ধরা ভেটকি মাছটার গোল চকচকে চোখে ছিল অপার রহস্য।...
>
> অভয় গিয়ে মরল টাকির পুলিশের ডাক্তারখানায়। বিচারে সাজা পায়নি কেউ। গেছে শুধু একটা মাছমারা।
>
> মরার চেয়ে ধরা পড়ে বেশি। ধরা পড়লেও বেড়ন খাওয়া রুখতে পারে না কেউ।[১৬]

মহাজনের রুদ্ররোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিচিত্র অভিসন্ধির আশ্রয় নিয়েও ব্যর্থ হয় মাছমারারা। এ-ব্যর্থতাকে আরো জমকালো করে তোলে মহাজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত নানান অনাহুত ও অশ্লীল উদযোগ। মহাজন তার প্রাপ্তি আদায় করতে চায় অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত উপায়ে :

> মাছমারাদের খারাপ কথা বলে মহাজন। বলে, তোমার বাড়িতে যাব হে। দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলব। বউয়ের শরীলে কাপড়চোপড় আছে তো। শুনেছি, মেয়েটি তোমার ডাগর হয়েছে।
>
> জলে মাছ নেই। ঘরে মেয়েমানুষ আছে। মহাজন উশুল চায়।...[১৭]

গঙ্গাবক্ষে মাছ মারার পর মাছমারাদের কাছে এসে ভিড় জমায় ফড়ে-পাইকার। সব ফড়ে-পাইকারকে মাছমারারা মাছ বিক্রয় করে না। এক্ষেত্রে পছন্দের পাইকারদের অগ্রাধিকার দেয় তারা। পাঁচু-বিলাসেরা মৌসুমের শুরু থেকেই মাছ মেরে তা তুলে দেয় দামিনীর হাতে। বিলাসের বাবা নিবারণের সময় থেকেই দামিনী তাদের সহায়। পাঁচু আর বিলাসের কথোপকথন লক্ষণীয় :

> বিলাস বলল, মাছ কি তুমি দামিনী বুড়ির জন্যে রাখলে ?
>
> — হ্যাঁ।
>
> — পেথম মাছ বুড়িকে দেবে ?
>
> — হ্যাঁ। নগদে দেব। ধার-দেনা আছে বুড়ির কাছে। সেটার শোধ এখন দেব না। দিন তো পড়ে আছে। কিন্তু পেথম মাছ আমাকে বুড়িকেই দিতে হবে।... বুড়ি বসে আছে আমাদের পথ চেয়ে। ও বাবা, না দিলে আমার পাপ হবে না ?[১৮]

মাছ মারতে এসে মাছমারাদের কেউ কেউ উদভ্রান্তের মতো ধরা দেয় মন্দমতি ফড়েনির পেছনে। জৈবিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য বেছে নেয় অনৈতিক পথ; মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হয় গৃহগত সুখস্মৃতি, নষ্টাচারে প্রলুব্ধ হয়, নিষিদ্ধ পল্লিতে বিচরণ করে অতঃপর যখন নৌকায় প্রত্যাবর্তন করে, তখন রক্তের মধ্যে নিয়ে আসে বিষ; সারা শরীরে বহন করে ছাপকা ছাপকা ঘা।

যে ক-মাস মাছমারারা গঙ্গাবক্ষে মাছের প্রত্যাশায় নিবিড়ভাবে তপস্যালিপ্ত থাকে, সে ক-মাস তারা প্রতিটি দিনক্ষণ-পর্ব-লগ্নের অনুপুঙ্খ হিসাব রাখে। জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিচিত্র বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা অন্তর্লোকে লালন করে নানান সংস্কার : ভরা কোটাল, মরা কোটাল, জোয়ান কোটাল, অমাবস্যা-পূর্ণিমার কোটাল ইত্যাকার শব্দবন্ধে পূর্ণ থাকে মাছমারাদের জীবন-অভিধান পাঁচুর প্রেক্ষণবিন্দু উৎসারিত বক্তব্য উপস্থাপন প্রসঙ্গে মাছমারাদের এসব জীবনানুষঙ্গ ও সংস্কার উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক :

> ... এই যে দেখছিস বর্ষায় জল বাড়ছে, একেই বলে জোয়ান কোটাল। তার রকম আছে। পারাপারের মাঝির কাছে, এই জোয়ান কোটাল। জল আরও বাড়ে ধরিত্রী রসস্থ হন অমাবস্যায় পুন্নিমাতে।
>
> তখন শুধু জল বাড়ে না। যত জল বাড়বে তত টান লাগবে। টের পাওয়া যাবে নৌকায় বসে। নৌকার তলা কাঁপছে থরথর করে। এত টান ! ওই টান-কাঁপানিকে বলে জোয়ান কোটাল... যখন আকাশে সোনার চাঁদ থাকে।... রাতে। পূর্ণিমার নিশির ভাটিতে হবে ভরা কোটাল।... মেঘ থাকবে সারা আকাশ জুড়ে, কখনও মুষলধারে, কখনও গুড়িগুড়ি জল ঢালবে, আর পুবে সাঁওটা ডাক ছাড়বে গোঁ গোঁ করে। এই হল জোয়ান কোটাল।...
>
> অমাবস্যায়ও জোয়ান কোটাল। তবে বর্ষাকালে পূর্ণিমার কোটালের জোর বেশি।
>
> কদিন থাকবে ? দ্বিতীয়া পর্যন্ত টান-কাঁপানি থাকবে। একেবারে চরমে উঠে, চতুর্থীতে ঢিল দেবে। দিতে দিতে অষ্টমীতে গিয়ে বাঁধন আলগা হয়ে যাবে। দশমীতে একেবারে শেষ। জোয়ান কোটালের একটা আসে, আর একটা যায়। মাঝে মরা কোটাল।[১৯]

'ভারী গোন' প্রসঙ্গেও ঔপন্যাসিকের বর্ণনাংশ অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক :

> সমুদ্রের বান যখন চেতে ওঠে। ফুলে ফেঁপে হাঁক পেড়ে যখন আসে। সে গঙ্গার চোরাবান নয়। মাথা-উঁচু ঢেউ নিয়ে আসে। সমুদ্রের বান যত বেশি উঠবে, তাকে বলে ভরা গোন। কিন্তু মাছ বানে নয়। জলটা যখন নামবে, তখন। এইটা নিয়ম, যত বেগে উঠবে, নামবে তার চেয়ে অনেক বেশি আগে। তাকে বলে, চলন্তা, মুকড়া জল, বলে একড়ি টান,...[২০]

গঙ্গায় মৎস্যপ্রাপ্তির সময়-অসময় প্রসঙ্গে পাঁচুদের ধারণা অত্যন্ত অভ্রান্ত। জালে কখন ইলিশ ধরা দেবে, কখন মাছ গঙ্গাবক্ষে ছা-পোনা ছাড়বে, সে-সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অগাধ। পাঁচুর মনোভাবনা লক্ষণীয় :

> অষ্টমী, নবমী, দশমীতে কিছু মাছ পাওয়া যায়।
>
> তারপরে ধরিত্রী শান্ত হল।... পৃথিবী দিবানিশি তাপ বদলাচ্ছেন। রসস্থ শরীরে ভার নেমেছে, জলও শান্ত হয়েছে। তার টান কমে গেছে।... মাছও... এসেছে ঘোলা

> মিঠেন জলের সুদিনের আশায়। কিন্তুন সে গা ভাসিয়ে আসতে পারে না উজানি মাছ সে। ওইটাই তার জীবন। সর্বক্ষণ সে বিপরীত পথে চলেছে ভেসে, তার আহার-মৈথুনে। সেই জন্যে ভাটা ঠেলে সে আসে সমুদ্র থেকে, জোয়ার ঠেলে যায় সমুদ্রে। উজান তার বাঁচা। সে তখন একটানা ভাসবে, যখন মরবে।... তার রুপোলি পেট জুড়ে আছে সোনা-মানিকেরা। লাখ লাখ সোনা-মানিক। ... অন্য মাছ খেতে পারে। সেজন্যে সে আসে গঙ্গার ঘোলা জলের অতল আঁধারে, শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে। এসে পেট থেকে ছেড়ে দিয়ে যায় তার সোনামানিকদের।[২১]

উপন্যাসে মাছ-মারার কৌশল বর্ণনায় ঔপন্যাসিক বিস্ময়কর পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*-র বর্ণনার[২২] সঙ্গে এ-বর্ণনাংশের রয়েছে লক্ষণীয় সাযুজ্য; যদিও সমরেশ বসুর বর্ণনা মাছমারাদের জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবনাভিধানের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত পাঁচুর দৃষ্টিকোণ থেকে সমরেশ বসু এতৎসম্পর্কিত যে বর্ণনাংশ প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপ :

> সাংলো জাল থাকে তোমার হাতে। জালের দুই মুখ লম্বা, দুই সলি পরানো আছে তাতে। সলি হল কঞ্চি। জালের মুখে সলি, জালের মুখ। ওপরের সলিতে বাঁধা কাছি। সেই কাছি ভাটার ভিতর দিয়ে বাঁধা আছে নীচের সলির সঙ্গে। জাল তোমার হাঁ করে থাকবে মাটিতে। নীচের সলিতে আছে শিল, অর্থাৎ ভার। ওই ভারে জাল নেমে যাবে জলের নীচে। আন্দাজ চাই। ঠেকিয়ে নাও জালটি মাটিতে। যখন ঠেকবে, তখন এক হাত তুলে রাখবে। সব সময়, পাতালের মাটি থেকে সাংলো এক হাত উঁচুতে থাকবে।
>
> নৌকা করো পুব-পশ্চিমে আড় পাথালি। ভেসে যাও পাথালি নৌকা নিয়ে ভাটার টানে। যে আসার, সে আসবে উজান ঠেলে তোমার জালে। পড়বে এসে হাঁ-মুখে। খবর পাবে কেমন করে? জালের ঠিক মাঝখানে বাঁধা আছে সরু সুতো। তাকে বলে খুঁটনি। সেই খুঁটনি জড়ানো তোমার আঙুলে, যে আঙুলে তোমার সমস্ত মন বসে আছে। জালে তোমার ছোট চাকুন্দে মাকুন্দে পড়লেও, খবর আসবে তোমার খুঁটনিতে। যেমনি খবর পেলে, ওমনি ওকোড় মারো কাছি ধরে। যত জোরে পারো। সাংলোর হাঁ বুজে যাবে কাপটি খেয়ে।[২৩]

মাছ মারতে এসে গঙ্গাবক্ষে অনেকেই বরণ করে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু। শাস্ত্রানুযায়ী এদের কারো কারো দাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। পাঁচু আর ঠাণ্ডারামের দাহক্রিয়া গঙ্গাতীরবর্তী শ্মশানে নিষ্পন্ন হলেও নিবারণের ভাগ্যে তা জোটেনি কারণ তার মৃত্যু হয়েছিল লোকচক্ষুর অগোচরে। সন্ধান মেলেনি তার মৃতদেহের। এভাবে কারো অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু হলে আত্মীয়-পরিজনরা নিকটবর্তী স্থানে কশার বেঁধে আসে। এ-নিয়মটি মাছমারাদের পরিচিতি :

> অগুনতি কাশের মুণ্ডু জট পাকিয়ে বেঁধে রেখে আসতে হয়। নতুন কোনও মাছমারা গেলে, সেই দেখে জানতে পারবে, সেখানে কোনও মাছমারার মরণ হয়েছে।[২৪]

মাছমারাদের জীবনে প্রায় প্রতিবছরই নেমে আসে বন্যার প্রতিকূল প্রকোপ। প্লাবন আর পাহাড়ি ঢলে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় তারা; সর্বস্ব হারিয়ে পথে নামে। জিজ্ঞেস করলে

জানা যায়, 'জাল পেতে মাছমারা নৌকা নোঙর করে রেখেছিল উঁচু পাড়ের কিনারে বিঘাখানেক জমি চাপা পড়ে নৌকাসুদ্ধ নিপাত দিয়েছে [২৫] এমতাবস্থায় বিপন্ন মাছমারারা হয়ে পড়ে রোদে-পোড়া, জলে-ভেজা শকুনের মতো: প্রাকৃতিক দুর্বিপাক আর পোকার আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত, ধ্বস্ত-ক্লান্ত, দৈহিক যন্ত্রণায় কাতর :

> আ ! কী জ্বালা গো হাতে পায়ে। বড় ব্যথা। পোকা বিড়বিড় করছে দগদগে হাজায়। দাঁড় বৈঠা ধরা যায় না। সাংলোর কাছি যায় না ধরে রাখা, কাঁচা দগদগে মাংসে কেটে বসতে চায়। গাবের আঠা মাখছে সবাই হাতে। যেমন করে প্রলেপ দেয় জালে, নৌকায়। কিন্তু রাক্ষুসে পোকা। ভেদ করে উঠছে গাবের আঠার আস্তরণ।
>
> রোদে শুকিয়ে জ্বালা। জলে ডুবিয়ে টনটনানি। ব্যথায় জ্বর তুলে দেয় গায়ে। দিলে কী হবে, জ্বরের উপর বৃষ্টি ধুয়ে যায়। প্রাণে বড় আগুন। ভিতরের জ্বলুনি তাতে নেভে না।[২৬]

শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক নয়, অনাহার-অর্ধাহারেও বিপন্ন হয় মাছমারাদের জীবন। গঙ্গাবক্ষে অবস্থানকালে তারা আক্রান্ত হয় কালান্তক ব্যাধিতে: বিশেষত আমাশয়ে। এ-ব্যাধি মূর্তিমতী সংহারিণীর রূপ ধরে আবির্ভূত হয় তাদের জীবনে :

> ...জলে জলে থাকার ওই আসল রোগ। ওই যে জাল ফেলে এক ভাবে বসে থাকা, কম খাওয়া আর পুবে ভারী বাতাস, তারই রোগ। মনে হয়, পেটে যেন দপদপ করে আগুন জ্বলছে। আঁজলা আঁজলা জল দেয় সবাই পেটে। তবু ঠাণ্ডা হতে চায় না। গড়গড়িয়ে ওঠে, আর নাভিকুণ্ডলের কাছে মোচড় দিয়ে ওঠে ব্যথায়। জিভটা মোটা মোটা লাগে মুখের মধ্যে। নাকের মধ্যে একটা কিসের গন্ধ অষ্টপ্রহর ভোঁতা করে রাখে বাকি গন্ধ। শরীর টলে কিংবা নৌকা দোলে, ঠাহর পাওয়া যায় না। জল পাক খায় না মাথা ঘোরে, অনুমান করতে গিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে পাটাতনের উপর। তারপর রক্তে টান পড়ে। ভয়ংকর রক্ত-আমাশা দেখা দেয়। মাছমারা যন্ত্রণায় কাঁদতে চায়, কান্না আসে না।
>
> ইতিমধ্যেই কয়েকজনের রোগ দেখা দিয়েছে। গতিক দেখে মনে হয় আরও হবে। এই সবই টোটার মার। মাছমারারা একটু পেট পুরে যে বারে খেতে পায়, সে বারে রোগের আমদানি কম। সে আসে, ঘোরাফেরা করে কাছে কাছে। দাঁত বসাতে পারে না।[২৭]

শ্রাবণ-টোটায় মাছমারারা যখন দিশেহারা, তখন তাদের জীবনানুষঙ্গে যুক্ত হয় পোকার উপদ্রব। পোকার দংশনে হাত দুখানিতে শুরু হয় প্রচণ্ড যন্ত্রণা, মাংস করে দগদগ আর পেটে লাগে ব্যথা। পোকার দংশনে পাঁচু অস্থির হয়ে উঠলে বিলাস শুরু করে তার শুশ্রূষা। এতৎপ্রসঙ্গে পাঁচু ও বিলাসের ক্রিয়া-কথনের মাধ্যমে মাছমারাদের জীবনবাস্তবতার স্বরূপ অঙ্কিত হয়েছে চমৎকারভাবে:

> বিলাস উঠে... বাঁশ-ফালির পাটাতন সরিয়ে গাবের আঠা বের করে, তিবড়িতে চাপিয়ে গরম করে নিল। তারপর মাখিয়ে দিল খুড়োর দুই হাতে। কিন্তু পোকাগুলি মানে না। ভিতরে দাপাদাপি করে।

বিলাস বলল, খুড়ো, সাংলো বাওয়া ছাড়ো তুমি, হাত দুখান যে ছিঁড়ে যাবে।
... বলল, বর্ষায় মাছমারার হাত অমন হবেই। তা বলে জাল ফেলা বন্ধ রাখব কেমন করে? মরে যাব না ?[২৮]

শ্রাবণ্যে টোটা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অনেক মাছমারা গঙ্গাবক্ষ থেকে পালিয়ে যায়; মহাজনের তর্জন-গর্জন, শাপ-শাপান্তও তাদের ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় : গঙ্গাতীরের নিরুপায় মাছমারারা এ সময় অবলম্বন করে ভিক্ষাবৃত্তি :

এ তল্লাটের মৎস্যজীবীদের পাড়ায়, বাচ্চা বুড়োরা বেরিয়ে পড়েছে শহরের রাস্তায়। ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। পাশের বাড়ির ফ্যান চেয়ে খাচ্ছে। ঘটিবাটি গেছে বন্ধক।[২৯]

এমতাবস্থায় গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের মাছমারারা প্রতিবিধানের উপায় বের করে সরকারি প্রতিনিধির শরণাপন্ন হয় তারা : দূর থেকে যারা এসেছে গঙ্গাবক্ষে, তারা তাকিয়ে থাকে অসহায় ভঙ্গিতে অন্যদিকে পূর্ব পাড়ের মাছমারারা মুখোমুখি হয় করুণ দশার : ইতোমধ্যে জাগ্রত মরণদেবতা হানা দিয়েছে তাদের ঘরে-ঘরে, 'তার ভয়ংকর সংহার-মূর্তি এক মাসের মারেই সব কিছু ভেঙে ফেলতে চাইছে। বাপ-ছেলেয় মারামারি করছে, বউ-সোয়ামি ছাড়াছাড়ি করছে : এই না মাছমারার জীবন। এক কোটালে বাঁচে আর-এক কোটালে মরে। মাছের প্রাণের চেয়েও তার আয়ু টলমল।[৩০] অথচ যে গঙ্গাকে পরিত্রাতা ভেবে মাছমারারা ছুটে এসেছে, সে-গঙ্গাও তাদের দুঃখে-দৈন্যে, বেদনায়-বিপর্যয়ে নির্বিকার, নিস্পৃহ ও উদাসীন : এ-উদাসীনতা সত্ত্বেও নিরুপায় মাছমারারা পরিশেষে গঙ্গারই শরণাপন্ন হয়; গঙ্গার পূর্বপাড়ের চরায় আয়োজন হয় 'নলেন টানা'র। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

সবশেষে গঙ্গার মুখোমুখি দাঁড়ায় সবাই। নিরুপায় সন্তানেরা দাঁড়ায় মায়ের কাছে। নলেন টানা শুরু হয় গঙ্গার পুব পাড়ের চরায়। একটু বেদি পাতে মাটির। সেখানে হত্যে দিয়ে পড়ে মাছমারা। একে বলে নলেন টানা। ...
জাল বাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আসে সবাই। বেদির সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দুজন। এই দুর্জয় সংহারিণী গঙ্গার সাক্ষাৎ চায় তারা। এই তাদের বিশ্বাস। চিরকালের এমনি চেনাশোনা, গঙ্গাকে বলতে হবে, এ তার কী মন, কেমন মতি। গঙ্গা বলুক, নইলে সে উঠবে না, বসবে না, খাবে না। আমরণ এই অনশন।... যারা আসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে, তারা গোল হয়ে ঘিরে হরিধ্বনি দেয়। জোয়ারের বেলায় এসে নামগান করে। মেটে ধূপদান থেকে ধোঁয়া ওঠে আকাশে।
যারা হত্যা দিয়েছে, তারা ভয়ার্ত ব্যাকুল স্বরে চিৎকার করে, মা — মা গো ! কী অপরাধ আছে মাছমারাদের বল মা ! আমাদের কী গতি হবে মা ! কী আছে তোর গর্ভে এবার বল, নইলে উঠব না।[৩১]

প্রায় প্রতিবছর গঙ্গার পশ্চিম পারের মাছমারারা অন্য এলাকার মাছমারাদের বঞ্চিত করতে চায় তাদের অধিকার থেকে। প্রকট স্বার্থপরতার কারণে তারা গঙ্গার এপার-ওপার জুড়ে পেতে দেয় বিশাল বাঁধাছাঁদি জাল : এর ফলে অন্য মাছমারাদের জীবনে নেমে আসে সর্বনাশা দুর্যোগ :

> বাঁধাছাঁদি বড় বাধা। এই জাল ফেললে এক হাত জায়গা থাকে না গঙ্গায়। সাংলো বলো, টানাছাঁদি বলো, কিছুই ফেলা যাবে না বাঁধাছাঁদি ডিঙিয়ে। শুধু তাই নয়। বাঁধাছাঁদি পেরিয়ে আর কোনও তল্লাটে মাছ যেতে পারবে না, আসতে পারবে না।[৩২]

গঙ্গা উপন্যাসে মাছমারাদের বিচিত্র জীবনসত্য উপস্থাপনে সমরেশ বসুর যে কৃতিত্ব তা অন্যত্র দুর্লভ। তিনি যে মাছমারাদের জীবনভূগোলে দক্ষ পরিব্রাজকের মতো পরিভ্রমণ করেছেন, উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাংশই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। মাছমারাদের প্রতিদিনের যাপিত জীবনসত্যের প্রত্যবেক্ষণে তিনি ছিলেন আন্তরিক, বয়নবিন্যাসে নিপুণ, এবং সর্বোপরি বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পাদনে বিস্ময়করভাবে সার্থক। পঞ্চানন মালো অর্থাৎ পাঁচুর চৈতন্যমূল উৎসারিত ভাবনাপ্রবাহ বিন্যাসের মাধ্যমে তিনি মাছমারাদের বিচিত্র জীবনপ্রকরণ উপস্থাপন করেছেন এ-উপন্যাসে। পাঁচুর মাধ্যমে একদিকে যেমন মাছমারাদের চলমান জীবনবাস্তবতার ভাষারূপ অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি তাদের জীবনপরিসরে নিকট অতীতে সংঘটিত নানান ঘটনাংশও হয়েছে চিত্রায়িত। অতীত আর বর্তমানের স্মৃতি-শ্রুতি আর বাস্তবতার সম্মিলনে উপন্যাসে সম্পূর্ণতা পেয়েছে মাছমারাদের যাপিত জীবনের সমগ্রসত্য। উপন্যাসের প্রায় শেষ পর্যায়ে গঙ্গাবক্ষে রোগাক্রান্ত পাঁচু মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর প্রাক্ পর্যায়ে বিলাসের উদ্দেশ্যে পাঁচুর উচ্চারিত সংলাপে নিঃসরিত হয়েছে মাছমারাদের জীবনবাস্তবতার সত্যস্বরূপ :

> ...বিলেস, এট্টা কথা বলি, মানুষ চিরকাল মাছ ধরবে। এ সোমসারের মানুষ মাছভাত খাবে। তুই মাছ মারিস। জীবনে তাতে তোর কিছু বাদ পড়বে না। তোর কল্যেন হোক। তুই দুধে-ভাতে খাস।...
>
> আমি এতদিন হালে বসেছি, এবার তুই বসবি বাপ। আমার আগে তোর বাবা বসত। তার আগে আমার বাবা।... তোর ভাই, আমার ছেলে, আগামী সনে তোর দাঁড় ধরবে। শাঙনে টোটার কথা বলিস তাকে। তুই টোটার শেষ দেখে যাস।[৩৩]

গঙ্গাবক্ষে বিলাসের নিবিড় আলিঙ্গনে ধলতিতার পঞ্চানন মালোর মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনাংশ উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে প্রধানত ঔপন্যাসিকের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে। স্বল্পপরিসরবিস্তৃত এ-অংশে প্রধানত বিলাস-হিমির প্রণয় ও লিবিডো প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হলেও গঙ্গাতীরবর্তী জনজীবনচিত্রায়ণেও এ-অংশটি বিশেষত্বপূর্ণ। গঙ্গাতীরবর্তী ফড়ে-ফড়েনির জীবনবাস্তবতার যে-চিত্র এ-পর্যায়ে প্রদর্শিত হয়েছে তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি সমৃদ্ধ। বিলাসকে উপলক্ষ করে হিমি তার যাপিত জীবনের যে কাহিনী বিবৃত করেছে, তাতে উদ্ভাসিত হয়েছে গঙ্গাতীরবর্তী ফড়েনিদের বাস্তব জীবনছবি :

> ... যেখানে তার জন্ম, লোকে বলে, সেইটাই পাপের বড় স্থান। ছোট বয়স থেকে সেখানকার পাশ কাটাতে পারেনি হিমি। পাপ তার নিজেরও অনেক। এ জীবনে কত দাগা পেয়েছে হিমি। এখানকার জীবনের চারপাশে শুধু অশেষ যন্ত্রণা ও অপমান। বড় মিথ্যে ভণ্ডামি, মন নিয়ে জুয়াচুরি। তাই না হিমি অকূলে ভাসতে চেয়েছে। সেখানে সংহারের মূর্তি যেমন ভয়ংকর ভালবাসাও তেমনি ছলনাহীন উত্তাল।[৩৪]

হিমিদের জীবনের এ-ছবি বংশানুক্রমিক সমাজনীতিবহির্ভূত এ-জীবন তারা যাপন করে উত্তরাধিকারসূত্রে স্রোতের শ্যাওলার মতোই তাদের জীবন; ভেসে চলাই যার অনিবার্য নিয়তি :

> ...চলতি সমাজজীবনের বন্ধন এদের সমাজে নেই। কিন্তু সমাজ একটা আছে। কতকগুলি রীতি আছে, নীতি আছে। সেগুলিকে সবাইকে মেনে চলতে হয়।
> দামিনীর স্বামী অল্প বয়সে মারা গেছে। তারপরেও তার যৌবন ছিল। পিরিত হয়েছে, ঘর করেছে আর-এক জনের। কেঁদেছে হেসেছে, সে যদি চলে গেছে, আর একজনও হয়তো এসেছে। এমনি করে স্বাধীন হয়েছে। যৌবন থাকতে যেন এখানে বৈধব্য নেই। তা বলে ভালবাসা নেই, এ কথা বলা যাবে না। নইলে কাঁদতে হবে কেন?
> এখানে কেউ গৃহস্থ, কেউ দেহ ও জীবিকা দুই-ই রেখেছে। কেউ কেউ মাছ বেচছে। পুজো পার্বণ, আটকৌড়ে বিয়ে শ্রাদ্ধ, সবই হয় এখানে।...
> মানুষ এখানে প্রাণের দায়ে ছোটে যত্রতত্র। পিরিত এখানে জীবনেরই রীতি। কখনও ঘরে না রইতে দেয়, অনলেই পোড়ে কখনও। রং লেগে গেলে তাকে ঢাকতে পারে না, চাপতে যাওয়ার সূক্ষ্ম মুনশিয়ানা অনায়ত্ত এদের। সে জন্য পিরিতের রশিটা সোনার শিকল নয়, লোহার শিকলও নয়, নেহাতই প্রাণের তন্তুতে পাক খাওয়া সূত্র। মনে না মানলে, মিথ্যা আর লুকোচুরি নেই, তাই হাসেও চেঁচিয়ে, অভিশাপও দেয় সরবে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, সবটাই বড় দুরন্ত, ভয়াবহ, উচ্ছৃঙ্খল ও আদিম।[৩৫]

জীবনগঙ্গায় ভেসে চলাই হিমিদের অনিবার্য নিয়তি। হিমি তাই একদিন মনের মানুষ ভেবে একজনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে পথে; প্রতারিত হয়ে অবশেষে এসেছে পালিয়ে। এক পর্যায়ে সে সম্পর্কিত হয়েছে বিলাসের সঙ্গে। কিন্তু তার পক্ষে 'বেবুশ্যে' জীবনের স্মৃতি বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয়নি; যেমন, আতরবালা বিস্মৃত হতে পারেনি তার অতীতকে। দুলালের সঙ্গে গৃহজীবনে স্থিত হয়েও সে পারেনি তার ক্লেদপঙ্কিল অতীতকে মুছে ফেলতে। মহাজন 'বাবু'রা এখনও তাই তার দেহসুধা পান করার জন্য ছুটে আসে আতর-দুলালের গৃহে। গৃহমধ্যস্থ মৃদুমন্দ আলোয় যখন 'বাবু'দের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত আতরবালা, তখন দাওয়ায় অসহায়ভঙ্গিতে বসে থাকে দুলাল; মুখখানি তার ফুলে ওঠে দহের পাকের মতো। এই আলোহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের স্বরূপ অঙ্কিত হয়েছে দুলালের বক্তব্যসূত্রে :

> ... বেবুশ্যে ছিল তো আগে। তাপরে মাছ বেচে খাবার শখ হল আমাকে পেয়ে। কিন্তু রূপবতী মেয়েমানুষ, হাটের বাস উঠিয়ে এলে কী হবে, তারা ছাড়ে না। আর মানুষের মন, তাতে এত রকমের চিত্তির-কাটা, রামধনুর চেয়ে বেশি রকমারি বাবা। বাবু এলে আতু না-না করে, তাপর বলে, 'এত সব বড় বড় বাবু মানুষ পায়ে পড়ে গো আমার।' বলে যেন স্বপ্নের ঘোরে বাবুর ঘরে গিয়ে ওঠে।
> তাপরে, বাবু চলে গেলেই সাপিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে একশা করবে। আমাকে মারবে ঠাস-ঠাস করে।[৩৬]

দুলালের এ-জীবনযাপন নিঃসন্দেহে দুঃসহ কিন্তু উপায়হীন এ-জীবনকে নিয়তি হিসেবে গ্রহণ করেছে রসিক। প্রতিপক্ষ মাছমারাদের সঙ্গে শিরদাঁড়া শক্ত করে বিবাদলিপ্ত হলেও রসিকের দুঃখ-দাহ অন্তহীন কারণ, তার স্ত্রী ব্রজেন ঠাকুরের দেহক্ষুধা পরিতৃপ্ত করে নিরুপায় রসিকের প্রাণ তাই প্রজ্বলিত হয় অষ্টপ্রহর

আষ্টপ্রহরিক যন্ত্রণা গঙ্গাতীরবর্তী ফড়েনিদের নিত্যসঙ্গী হলেও তাদের জীবনেও রচিত হয় নিঃস্বার্থ প্রেমসম্পর্ক। বিলাসের সঙ্গে হিমির সম্পর্ক কোনো অর্থনৈতিক প্রলুব্ধতাজাত নয়, বরং হার্দ্যটানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশমাত্র। বিলাসের মনোদৈহিক শক্তি ও সৌষম্য তার জাগরচৈতন্যে সঞ্চারিত করে তীব্র অভিঘাত। সে তাই গঙ্গাতীরস্থ 'বেবুশ্যেপাড়া' পরিত্যাগ করে ধলতিতার বিলাসের সঙ্গে স্থিত হতে চায় নীড়াশ্রয়ী গৃহীজীবনে কিন্তু বিলাস যে নিলাম্বুধি বিশাল তার দেহে তো অবিরাম ঝড় তোলে সাঁইদার নিবারণের রক্ত সে 'গঙ্গার বারোমাসের মানুষ' হতে চায় না; সাঁই হয়ে যেতে চায় সমুদ্রে। বিলাসের এ প্রবল ইচ্ছার কাছে নিজেকে বড়োই অসহায় মনে করে গঙ্গাতীরবাসিনী হিমি :

> পায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে বলল হিমি, সাহস পাইনে ঢপ। আমি এতটুকু প্রাণী, তোমার অকূলে আমি বেড় পাব না। এই আমার বড় মন-চনমনানি ছিল। তুমি যাবে অকূল সমুদ্রে, আঁধার রাত্রে আমার পাণ পুড়বে, তোমার নাগাল তো আমি পাব না।[৩৭]

তাই 'অকূল সমুদ্রে'র বেড় পেতে ব্যর্থ হয় কূলবতী গঙ্গা। বিলাসের পরিবর্তে সে তাই 'শ্যেপাড়া'কেই জীবনের গতি ও নিয়তিরূপে চিহ্নিত করে; পরিত্যাগ করে অসীম অকূলকে অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। উপন্যাসের পরিশেষে তাই 'তেঁতলে বিলাস' হয়ে ওঠে সাঁইদার বিলাস; সমুদ্রযাত্রাই যার পরম নিয়তি :

> বেতনা নদীতে, কালীনগরের গঞ্জের ভেড়িতে শাবর করেছে আঠারো গণ্ডা নৌকা। মাছমারাদের নৌকা, সাঁই নিয়ে সমুদ্রে যায় তারা। অগ্রহায়ণ পড়ে গেছে। উত্তরে বাতাস বয়। পালে হাওয়া লেগে গেছে, ডাক দিয়েছে সমুদ্র। ঢেউ লেগেছে রাইমঙ্গল আর ঝিল্লের মোহনায়। কালীনগর গঞ্জ থেকে চাল ডাল নুন তেল জোগাড়যন্ত্র হয়েছে। সাঁইদারের অপেক্ষা।
>
> – সাঁইদার কে?
>
> – বিলেস। তেঁতলে বিলেস।
>
> তেঁতলে বিলেস সমুদ্রে যায়।[৩৮]

এভাবেই *গঙ্গা* হয়ে উঠেছে কূল থেকে অকূল যাত্রার কাহিনী। প্রতীকী অর্থে বিলাসের এই সমুদ্রযাত্রা যেন স্বয়ং সমরেশ বসুর নিরন্তর সাহিত্যযাত্রারই নামান্তর; সীমা থেকে অসীমা, বিন্দু থেকে বৃত্তপথে অভিসারযাত্রারই বৃত্তান্তকথন। ইতঃপূর্বে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* নদীনির্ভর ধীবরশ্রেণির জীবনভিত্তিক হলেও *গঙ্গার* সঙ্গে এ-দুটো উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। *পদ্মানদীর মাঝিতে* পদ্মাবক্ষের পরিবর্তে পদ্মাতীরবাসীদের জীবনচিত্র এবং কুবের-কপিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে চরমমূল্য প্রদান

করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে ধর্মসম্প্রদায়-নিরপেক্ষ তিতাসতীরবর্তী কৃষক ও ধীবরশ্রেণির আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের চালচিত্র পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ *গঙ্গা* উপন্যাসে সমরেশ বসুর প্রয়াস ব্যতিক্রমধর্মী। এ-উপন্যাসে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রধানত গঙ্গাবক্ষে। গৃহ ও পরিবারবলয়কে কেন্দ্র করে *গঙ্গায়* যেসব দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে সেসবের পরিসর নিতান্তই স্বল্প গঙ্গাবক্ষে নিরন্তর ভাসমান মাছমারাদের দুঃসহ জীবনসংগ্রামের চিত্রায়ণই এ-উপন্যাসে মুখ্য। পরিশেষে নদীকে অতিক্রম করে এ-উপন্যাসের কাহিনী হয়ে উঠেছে সমুদ্রসন্ধানী।

সমরেশ বসু *গঙ্গা* উৎসর্গ করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)-কে। এ-উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রভাব পড়েছে তারাশঙ্করের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসের। "গঙ্গা' উপন্যাসের থিমে নয়, প্যাটার্নে নয়, কথন ভঙ্গিমায় অস্পষ্ট হলেও তারাশঙ্করের ছায়া এসে গিয়েছে।[৩৯] *হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়* ত্রিকালক সুচাঁদ বুড়ি গোষ্ঠীপরম্পরাবাহিত স্মৃতিলোক থেকে ভগবান কালরুদ্রের যে পুরাণকথা[৪০] বিবৃত করে, *গঙ্গা* উপন্যাসে সমরেশ বসুও ধলতিতার রাম মালোর স্মৃতিলোক থেকে বয়ান করেছেন বাদার মালোদের প্রথম পুরুষের রহস্যময় আবির্ভাব-প্রসঙ্গ :

> ...এমনি ছেল ওয়াঁর মুত্তিখানি। মালোর ঘরের সেই পেথম পুরুষ। না, মালো জাতের কথা বলছিনে। এই তোমার সেকালের বাদার মালোদের পেথম পুরুষদের কথা বলছি। সে কি আজকের কথা। চোদ্দ পুরুষেরও চোদ্দ পুরুষ আগে। ওয়াঁর কল্যাণেই সমুদ্দুর পারের মালো বংশ বড় হয়েছেলে, ছইড়ে পড়েছেলে। মালোরা ত্যাখন রাজা হয়েছেল দেশের। শুনিচি, দক্ষিণ দে' হেঁটে এয়েছেলেন। দিগম্বর কালো কুচকুচে এক পুরুষ, কোঁচকানো চুল ফণা ধরে আছে কপালের ওপর। গায়ে আর কিছু নেই। হাতে এক মস্ত ক্যাঁচা। ডাঙায় এসে ওয়াঁর বড় বেপদ হল। দক্ষিণ রায়ের রাজ্যি। ছেড়ে কি কথা কয়। ত্যাখন অবশ্যি ধলতিতেও বাদা। আসার পথে নড়ুই হল দক্ষিণ রায়ের চেলাদের সঙ্গে। জিতলেন উনি। দক্ষিণ রায় খুশি হয়ে মস্ত একখানি গায়ের ছাল দিলেন ওয়াঁরকে পরতে। ওই হল ওয়াঁর আসল মুত্তি। বাঘের ছাল-পরা, ক্যাঁচা হাতে কালো কুঁচকুঁচে পুরুষ। তোমার গোটা সমুদ্দুরের পার ধরেই ছেল ওয়াঁর রাজ্যি।[৪১]

মাছমারারা তাদের দুর্ভাগ্যপ্রপীড়িত পতিত জীবনকে মেনে নিয়েছে নিয়তির অত্যাজ্য বিধান হিসেবে। এজন্যে তারা মা-মনসার লৌকপুরাণিক বৃত্তান্তের সঙ্গে নিজস্ব কল্পবুদ্ধির যোগে যে-কাহিনী গড়ে তুলেছে তা নিম্নরূপ :

> সে বহুদিন আগের কথা। ঝালো-মালোর ঘরে এসেছেন তাদের গুরুদেব। গুরুদেব বলে কথা। সাক্ষাৎ ভগবান-তুল্য। সেবা করো, ভক্তি করো। তখন মালো পতিত নয়। দুই ভাই ভক্তিভরে সেবা করলে গুরুর।
>
> তারপর গুরুদেবের ভোজন হল। নিদ্রা দিয়ে উঠে গুরুদেব গেলেন পায়খানায়। বললেন, মালোরে মালো, জলটা একটু এগিয়ে নিয়ে আয়।
>
> গুরুর আদেশ। তার ওপরে তো কথা চলে না। কিন্তু মালো যে ! জল সারবেন গুরুদেব, তা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাকে। তবে রইল গুরুর আদেশ। আমার দ্বারা হবে না।

গুরুর আদেশ অমান্য। ওরে মালো, পতিত হবি যে !
হই হব। তবু, ওটি আমার দ্বারা হবে না। গুরুরও এক কথা, মালোরও এক কথা। যা পারব না, তা পারব না।
ঝালো গিয়ে তাড়াতাড়ি জল এগিয়ে দিল গুরুদেবকে। গুরুদেব খুব খুশি। সেই থেকে মালো গেল পতিত হয়ে।[৪২]

শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকবঞ্চিত মাছমারাদের জীবন সংস্কারাচ্ছন্ন। অভাব-অনটন-দুঃখ-দারিদ্র তাদের জীবনে যুক্ত করেছে বিচিত্র আধিভৌতিক বিশ্বাস গঙ্গাবক্ষে মাছ মারতে গিয়ে প্রতিকূল জীবনস্রোতে ভাসমান মাছমারারা প্রতিপদে মুখোমুখি হয় প্রবল সংস্কারবুদ্ধির অগ্রজ নিবারণের এতদ্বিষয়ক বক্তব্য পাঁচুর স্মৃতিলোক থেকে উৎসারিত হয়েছে এভাবে :

..."দ্যাখ পাঁচু, টানের সমুদ্দুর, তাকে বিশেষ ভয় নাই। কিন্তু খবোদ্দার, ডাঙার দিকে চোখ ফেরাসনে। ডাঙার তুক, বড় তুক। নোঙর ফেলে বসে আছিস গালে হাত দে'। শুনতে পাবি, কে যেন ডাকছে ডাঙা থেকে। ফিরে তাকে দেখবি, মানুষ, মেইয়ে মানুষ। ভারী অবলা জীব, বড় বিপদে পড়ে তোকে ডাকছে, ওগো ভাল মানুষের ছেলে, ও মাঝি, বাঁচাও গো! আমার কেউ নাই গো! দেখবি, একপিঠ চুল, ফুটফুটে মুখখানি, ডাগর-ডাগর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। আহা! পুরুষ মানুষের পান তো। অমনি তোর বুকের মধ্যে হাঁকপাঁক করে উঠবে। সাত তাড়াতাড়ি নোঙর তুলে, হাল মেরে ছুটে যাবি, কেমন তো?... কিন্তুন্ খবোদ্দার। যাস তো ওই যাওয়াই শেষ যাওয়া। আর কোনওদিন ফিরে আসতে পাবিনে। ডাঙায় নেবে দেখবি, ওই অবলা জীব কালান্তক যম। অ্যাত্ত নাম্বা শরীল। গেরিমাটি রং, গায়ে কালো কালো ডোরা। ইনি হলেন দক্ষিণ রায়। সোঁদর বনের রাজা। ডাঙার যত তুক সব ওয়াঁর। কত যে ওয়াঁর ছদ্মবেশ। হিসেবে কুলিয়ে ওঠা দায়। রাতবিরেতে, নয়তো সোঁদর বনের পাশে, নোঙর করলে, ওয়াঁর নাম নিতে নাই। দক্ষিণ রায়ের আর এক নাম বড় শেয়াল। ডেকে নে' গে' মুণ্ডু ধড়ছাড়া করে মড়মড় করে চিবুবে।"[৪৩]

জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে মাছমারাদের অসহায়তা যেহেতু প্রবল, সেহেতু সংস্কারবুদ্ধিও তীব্র। তাদের জীবনের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যুক্তিহীন আচারের উপস্থিতি ব্যাপক। যাত্রাকালে কাঁকড়া-কচ্ছপ-কলাকে তারা চিহ্নিত করে অযাত্রিকরূপে। গঙ্গাবক্ষে যতদিন তারা অবস্থান করবে, ততদিন তারা সযত্নে মান্য করে কিছু বিধিনিষেধ। এ-সময় তারা চুল-দাড়ি কাটবে না, কাপড় ছাড়বে না। অনাচার করলে অপঘাত মৃত্যু অনিবার্য। টিকটিকির ডাক তারা মনে করে বেদবাক্যের মতো অমোঘ। এতৎপ্রসঙ্গে তাদের জীবনবৃত্তে প্রচলিত লোকবিশ্বাস নিম্নরূপ :

ওঁয়াকে শুধু একখানি জীব ভাবলে হবে না। শাস্তরে বলেছেন, খনার জিভখানি কেটে নে মিহির রেখে দিয়েছিলেন গর্তে। সেই জিভটি খেয়ে ফেলেছিল টিকটিকিতে। খনার বচন হলেন বেদবাক্যি। জিভ খেয়ে ফেলে, টিকটিকিরও গুণ হয়েছে ডাকের।[৪৪]

গঙ্গা উপন্যাসে মাছমারাদের উৎসব-পার্বণের বর্ণনায় সমরেশ বসু সংযতবাক অবশ্য স্বল্প পরিসরে বর্ণিত হয়েছে দু-একটি পূজানুষ্ঠানের বর্ণনা প্রতিকূল জীবনবাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে অসহায় মাছমারারা দেবতার উদ্দেশ্যে যে পূজার্চনা নিবেদন করে তা হচ্ছে 'নলেন টানা' শ্রাবণ্যে টোটা যখন সংহার মূর্তি ধারণ করে মাছমারাদের নিয়ে সর্বনাশা খেলায় মেতে ওঠে, জীবিকার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তারা শরণাপন্ন হয় গঙ্গার। এ-পূজাপ্রদানের প্রকৃতি প্রসঙ্গে উপন্যাসে প্রদত্ত বর্ণনাংশ নিম্নরূপ :

> ...গঙ্গার মুখোমুখি দাঁড়ায় সবাই। নিরুপায় সন্তানেরা দাঁড়ায় মায়ের কাছে। নলেন টানা শুরু হয় গঙ্গার পুব পাড়ের চরায়। একটু বেদি পাতে মাটির। সেখানে হতো দিয়ে পড়ে মাছমারা। একে বলে নলেন টানা।
>
> ...বেদির সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দুজন। এই দুর্জয় সংহারিণী গঙ্গার সাক্ষাৎ চায় তারা। এই তাদের বিশ্বাস। চিরকালের এমনি চেনাশোনা, গঙ্গাকে বলতে হবে, এ তার কী মন, কেমন মতি। গঙ্গা বলুক, নইলে সে উঠবে না, বসবে না, খাবে না। আমরণ এই অনশন। দুকূলপ্লাবী এই জল। শুধু জল তো নয়। যে মহাপ্রাণ রয়েছে, মা বলেছে তাকে তারা। তবে কেন বলবে না। যারা আসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে, তারা গোল হয়ে ঘিরে হরিধ্বনি দেয়। জোয়ারের বেলায় এসে নামগান করে। মেটে ধূপদান থেকে ধোঁয়া ওঠে আকাশে।
>
> যারা হত্যে দিয়েছে, তারা ভয়ার্ত ব্যাকুল স্বরে চিৎকার করে, মা– মা গো! কী অপরাধ আছে মাছমারাদের বল মা! আমাদের কী গতি হবে মা! কী আছে তোর গর্ভে এবার বল, নইলে উঠব না। ...
>
> সারা অঙ্গ কাঁপে থরথর করে। বেদির সামনে মুখ ঘষে গ্যাঁজলা ওঠে বাসি মুখে। – মা... মা গো।[৪৫]

মাছমারাদের সর্বজনীন পূজোৎসব হচ্ছে গঙ্গাপূজা, যা 'সাজার' নামে পরিচিত। এ-উৎসবের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে প্রদত্ত বর্ণনাংশ নিম্নরূপ :

> সাজার হল মাছমারাদের সার্বজনীন গঙ্গাপুজো। সবাই মিলে চাঁদা দেয়। হাতে ধরে কেউ টাকা-পয়সা দেয় না। মাছমারারা একটি ভাটার পাওয়া মাছ সব দিয়ে দেয়, যাদের উপর সাজারের ভার থাকে। তাকে বলে 'সাজাভাটা'। সেই মাছ বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায়, তাতেই সার্বজনীন গঙ্গাপুজো হয়। তাতে কে কত বেশি দিয়েছে, কম দিয়েছে, সেটা কোনও কথা নয়। যা পায়, তাই দেয়। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে বইকী। যে যত বেশি গড়ান মারতে পারবে, সে তত বেশি দিতে পারে। তারা নাম হয়, মান বাড়ে।[৪৬]

সাজার উৎসবে কলকাতা থেকে বড় বড় যাত্রাদল আসে। এ-সময় কম করে পাঁচ রাত যাত্রাগান চলে, মাইকযোগে কবি-কীর্তন গান হয়। মেয়েরা সাজসজ্জা করে এ-উৎসবে শরিক হয়। কেউ যায় কালাচাঁদের মন্দিরে, কেউ যায় কালীদর্শনে। এক পর্যায়ে—

> সাজার এসে গেল। পাড়ার মধ্যেই একটি খোলা জায়গায় মাথায় তেরপল দিয়ে দিব্যি ঢাকা হয়েছে। প্রতিমার মাটির সঙ্গে রং পড়ে গেছে। ঢাক-কাঁশি উঠেছে বেজে, টাকুর টাকুর, ঢ্যাং টানা, কাঁই না না, কাঁই না না।

> এ পাড়া, আর তার আশেপাশে গৃহস্থ, আধা-গৃহস্থ, দেহোপজীবিনী, সকলের মধ্যেই সাড়া পড়ে যায়। একটু যেন কেমন। নেশা-ভাং একটু বেশি চলে সকলেরই, কি মেয়ে, কি পুরুষ।[৪৩]

গঙ্গা উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণে সমরেশ বসু যথাসম্ভব বাস্তবতাঘনিষ্ঠ প্রত্যেকটি চরিত্রের ভাব-ভাবনা, আচরণ-উচ্চারণ, কর্মোদ্যোগ-কর্মবিমুখতা, রাগ-অনুরাগ, হতাশা-ব্যর্থতা, আবেগ-অনুভূতি গঙ্গানির্ভর জনশ্রেণির যাপিত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে চিত্রিত করেছেন সমরেশ বসু। উপন্যাসে সাইদার নিবারণের শরীরী উপস্থিতি না থাকলেও পাঁচুর অন্তর্লোকের আলোক-আবেগে চরিত্রটি অর্জন করেছে অলোকসামান্য বিশিষ্টতা পাঁচুর স্মৃতিলোক-উৎসারিত ভাবনাপ্রবাহের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে অগ্রজ নিবারণের অসম সাহস, অনমনীয় দৃঢ়তা ও ঋজু পৌরুষের প্রতিচ্ছবি। প্রায় সাতবছর পূর্বে গঙ্গাবক্ষে অপঘাত-মৃত্যু বরণ করেছিল সাইদার নিবারণ। 'মানুষ যেমন শক্ত ছিল, তেমনি কুটকচালে ছিল ঠিক মাছের মতো পালাবার উপায় ছিলনা মাছের জলের আকার দেখলে ঠাওর করতে পারত, ঝাঁক কোন দিকে। লোকে বলত গুণ জানে।'[৪৪] তার রক্তে ছিল সমুদ্রের নেশা। মাছমারাদের কেউই তার মতো এতবার সমুদ্রে যায়নি। 'সাইদার নিবারণ' নামেই সে সর্বত্র পরিচিত। 'টানের মরশুমে দশ-বিশ গণ্ডা জেলে-মালো জুটিয়ে, ত্রিশ চল্লিশটি নৌকা আর পঞ্চাশ-ষাটটি জাল নিয়ে' সমুদ্রযাত্রা করতো নিবারণ। পাঁচুর দৃঢ় বিশ্বাস– 'তার দাদা গুণিন ছিল। জলের কারসাজি যেমন বুঝত, তেমনি বনের কারসাজিও ঠাওর করত ঠিক।'[৪৯] পাঁচুর জীবনে নিবারণের উপস্থিতি ছিলো বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণে'র শ্রীরামচন্দ্রের মতো। পাঁচুর অন্তর্ভাবনা লক্ষণীয় :

> ...শ্রীরামের মতো দাদা ছিল যে, তার চেয়ে বড়, অত বড় দোসর আর পাঁচুর কেউ ছিল না। ছিল পিঠোপিঠি। কিন্তু হাতে ধরে সব শিখিয়েছে পাঁচুকে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে সবখানে। রাগ হলে দু-ঘা দিয়েছে। সোহাগ হলে চুলের মুঠি ধরে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিয়েছে। আর খালি বলেছে, বানচত, খা। খা বানচত। বেশি রেগে গেলে, শালা-সুমুন্দি করতেও ছাড়েনি। যা মুখে এসেছে, তাই বলেছে।[৫০]

স্পষ্টত শ্রীলক্ষ্মণতুল্য পাঁচুর প্রতি শ্রীরামতুল্য নিবারণের স্নেহানুশাসন মাছমারাদের জীবন ও সংস্কৃতির অনুকূল। এক্ষেত্রে সমরেশ বসুর সার্থকতা প্রশ্নাতীত। নিবারণের মনের ক্ষমতা যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো দেহের ক্ষমতা। গর্জমান সমুদ্রবক্ষে নিবারণের বিচরণ দেখে পাঁচুর মনে হতো 'ক্যাঁচা হাতে ঘুরছে একটি মানুষ-মূর্তি বাঘছাল তার পরনে। শিকারির নিবিষ্ট চোখে খুঁজছে মাছ। এ স্বপ্ন দেখতে দেখতে যখন নিজেদের দিকে ফিরে তাকায়, তখন যুগপৎ ভয়ে ও গর্বে ভরে ওঠে পাঁচুদের বুক।'[৫১] বলা বাহুল্য, অগ্রজ নিবারণের অকৃত্রিম গুণমুগ্ধ একটি চরিত্র পাঁচু নিবারণের গুণকীর্তনে সে যেমন অকুণ্ঠচিত্ত, তেমনি তার প্রতি বিশ্বাসে-শ্রদ্ধায় নতজানু। বংশজ ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের প্রতি মমত্ব ও দায়িত্ববোধের প্রকাশ-প্রেরণায় সে নিঃসন্দেহে এক অনুপম সত্তা।

উপন্যাসের রূপবান চরিত্র বিলাস; নিবারণ সাইদারের যোগ্য উত্তরসূরি সে অবলম্বন করেছে পৈতৃক পেশা বিলাসের মধ্যে অগ্রজ নিবারণকেই প্রত্যক্ষ করে পাঁচু তার মনে হয়–

> ঠিক যেন সেই পুরুষ... তেমনি চেহারাখানি বিলাসেরও। তেমনি হাঁক-ডাক, তেজ-জেদ, সবই আছে। কাজে যদি মন দেয়, তা হলে খুব দড়ো। ...বাপের ব্যাটা তো ! সেই বাপ না হলে ওর রাশ টানবে কে। তাই ছেলের একটু উড়ু-উড়ু ভাব।[৫২]

বাইশ বছরের শক্ত-সমর্থ যুবক বিলাস পিতার মতোই সে সাহসী, অভিযানপ্রিয়, মাছমারায় পারঙ্গম। সে নিয়তিনির্ভর নয়; কর্মবিমুখ অলসও নয়. ইতোমধ্যে সে সমুদ্রেও গেছে দুবার। শহরের প্রতিও রয়েছে তার দুর্বার আকর্ষণ পিতার মতোই তার স্বভাব; 'মটমট করে কাঠ ভাঙবে। কটকট করে কথা বলবে। বাপের মতো বুকের ছাতি। গাছের গুঁড়ির মতো চওড়ায় আর পাশে। নড়লে চড়লে মাংসপেশি সারা অঙ্গে কেউটের মতো ওঠে কিলবিলিয়ে।'[৫৩] দৈহিক শক্তিতে সে অতুলনীয়; বাছাড়[৫৪] হিসেবে স্বীকৃতিই তার প্রমাণ। ক্ষমতাবানদের প্রতি তার বিরূপতা ও তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ্য মাছমারাদের জীবনে মহাজনের ভূমিকা সম্পর্কেও তার ধারণা স্পষ্ট। এজন্য মহাজন সম্পর্কে উপন্যাসে সে প্রকাশ করেছে তীব্র খেদ। সে বিশ্বাস করে– মহাজন না হলে মাছমারাদের যেমন চলে না, ঠিক তেমনি মাছমারা না থাকলে মহাজনদেরও চলে না। মহাজনদের সঙ্গে মাছমারাদের এ-সম্পর্ক সম্পূরক। তাই মহাজনদের প্রতি পাঁচুর একমুখী আনুগত্য প্রত্যক্ষ করে বিলাস ঋজুতার সঙ্গে উচ্চারণ করে :

> আমাকে ঋণ দে' তো মহাজন খায়। আমি যদি ঋণ না নে' না খেয়ে মরি, মহাজনে বাঁচে কমনে? ঋণের জোরেই তো?[৫৫]

বিলাস সংস্কারমুক্ত, স্বাধীন চৈতন্যভূমিতে স্থিত। এজন্য সাধু-সন্ন্যাসীদের গুঞ্জরিত ধর্মভক্তির মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করে প্রতারণাবুদ্ধি এবং অসাধুতা। গঙ্গাতীরের শ্মশানঘাটে সাধুবাবাজি সম্পর্কে তার উচ্চারিত উক্তি শ্রবণ করে পাঁচু আতঙ্কিত বোধ করলেও বিলাস যথার্থই নির্বিকার। পাঁচুর ও বিলাসের কথোপকথনে এ-বক্তব্যের সারবত্তা স্পষ্ট :

> কপালে-সিঁদুর একটি সাধু ঝিমুচ্ছে বসে ভাঙা মুমূর্ষু ঘরের দরজায়। আর জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বসে আছে দুটি পাঁশুটে কুকুর।
>
> দাঁড় বাইতে বাইতে হেসে বলল বিলাস, আহা রে, বাছাদের আমার শোক দ্যাকো দিনি একবার।
>
> অবাক হয়ে পাঁচু বলল, কার কথা বলছিস রে!
>
> –ওই সাধুবাবাজি আর কুকুরের কথা বলছি। মড়া আসেনি, বেচারিদের ঝিমুনি কাটছে না।
>
> –হেই হেইরে শোর, কাকে কী বলছিস তুই? তোর পানে ডর নেই ?
>
> –কেন ?
>
> –কেন ? আরে গাড়ল, ওঁয়ারা যে অন্তর্যামী।
>
> বিলাস হেসে উঠে বলল, কারা ? ওই মড়া খেকোগুলান ?[৫৬]

পিতা নিবারণের মতোই বিলাস প্রতিবাদী কদম পাঁচুকে তার শ্বশুরে মহাজন ব্রজেন ঠাকুর অশ্রাব্য ভাষায় গালমন্দ করলে তীব্র প্রতিবাদে বিস্ফারিত হয় বিলাস তার এ-প্রতিবাদী স্বরে বিজ্ঞাপিত হয় স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি তার আন্তরিক মমত্ববোধ। কেদমে পাঁচুর চল্লিশ হাত লম্বা খুঁটে জালের ওপর বারো দাঁড়ি মহাজনী নৌকার তাণ্ডবের বিরুদ্ধে বিলাসের সময়োপযোগী প্রতিবাদ তার ঋজু পৌরুষকেই সুচিহ্নিত করে। এই পর্যায়ে গঙ্গার পশ্চিম পারের মাছমারারা রসিকের নেতৃত্বে বাঁধাছাদি জাল পাতলে বিলাস কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করে কার্যকর উদ্যোগ, এবং তাদেরকে এ-প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয় তার মধ্যে যে নেতৃত্বের সহজাত গুণ বিদ্যমান তা এ-সব ঘটনাংশের মাধ্যমে প্রমাণিত। এর ফলে তাবৎ মাছমারাদের কাছে বিলাসের চরিত্র পায় দৃঢ়মূল ভিত্তি

বিলাসের জীবননদীতে নোঙর ফেলেছে দুজন নারী : একজন গামলি পাঁচি[৫০], অপরজন হিমি। গামলি পাঁচির আবির্ভাব বিলাসের জীবনে আকস্মিক ও ক্ষণকালীন হলেও হিমি এসেছে উৎসবের আমেজ নিয়ে। প্রথম দর্শনেই বিলাস কৌতূহলী হয়ে ওঠে তার প্রতি। তার চড়া-সুরে-বাঁধা তারে আলতো করে টঙ্কার তোলে হিমি। বিলাস দেখতে পায় 'গায়ে জামা নেই একখানি শাড়ি পরে এসেছে। গাঢ় নীল দক্ষিণের সমুদ্রের মতো। তার ওপরে ছড়ানো সাদা রঙের ফুল। যেন সোনার মতো সোনা খড়কে মাছ ছিটিয়ে দিয়েছে। গায়ের রংটি কটা কটা। খোলা চুল বাঁধা আছে আলগা করে। চোখ মুখ একরকম। দেখে মনে হয় বটে, একটু যেন ভাব-গম্ভীর মেয়ে। গড়নটি একটু ছিপছিপে। হাতে গলায় নাকে কানে সোনাও আছে। সাতরকম মিলিয়ে দেখতে ভালই। বয়স কত আর। দেখে মনে হচ্ছে, ছেলেপুলে হয়নি আজও। গড়ন-পিটনে একটু ছেউটি ছেউটি। অর্থাৎ শরীরখানি অকূল হয়নি, কূলের মুখে এসে থমকে আছে। বর্ষা এলে ভাসবে অকূল পাথারে।'[৫৮]

অতঃপর বিলাসরূপী বর্ষার আবির্ভাবে হিমির মগ্নচৈতন্য আন্দোলিত হয় প্রবলভাবে। সে ভাসতে থাকে কূলহীন অকূলে। কিন্তু বেরুশ্যেপাড়ার জীবন-পরিবেশ ত্যাগ করে পরিশেষে নীলাম্বুধি-বিশাল বিলাসের নাগাল পেতে ব্যর্থ হয় সে। নিয়তি তাকে ফিরিয়ে নেয় তার আজন্ম যাপিত জীবনপরিবেশে।

বিলাসের জীবনে হিমির আবির্ভাব অনিবার্য কি না, এ-প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই উপস্থাপনযোগ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*র কুবের-কপিলার মতোই সমরেশ বসু এ-উপন্যাসে বিলাস-হিমির প্রেম ও লিবিডো সম্পর্ককে শিল্পমূল্যদানে ছিলেন সচেষ্ট। কিন্তু এ-সম্পর্কটি কাহিনীর অনিবার্য আকর্ষণে এ-উপন্যাসে সংগ্রথিত হয়েছে এ-কথা বলা যাবে না। হিমি চরিত্রাঙ্কনে লেখকের মধ্যবিত্তীয় প্রেম ও রোমান্টিক শিল্পদৃষ্টির উপস্থিতি লক্ষণীয়।[৫৯] উপন্যাসে বিলাসের জীবনপরিণাম প্রদর্শনেও হিমির ভূমিকা অত্যাবশ্যক বলে মনে হয় না। কাহিনীর পারম্পর্য রক্ষায় এবং প্রতিপাদ্যতত্ত্ব নির্ধারণে হিমির উপস্থিতি মনে হয় একান্তই আরোপিত।

দামিনী চরিত্রাঙ্কনে লেখকের সমৃদ্ধ জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্ট সে গঙ্গাতীরবর্তী ফড়েনিদের সার্থক প্রতিনিধি, বেবুশ্যেপাড়ার বাসিন্দা হয়েও মানবীয় বৈশিষ্ট্যে সে উজ্জ্বল। নিবারণ, পাঁচু এবং বিলাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল একান্তই সম্ভ্রমের এ-চরিত্রটি সমরেশ বসুর অত্যাশ্চর্য শৈল্পিক পরিমিতবোধের স্বাক্ষর উপন্যাসে সয়ারাম চরিত্রের বিচরণক্ষেত্র সীমিত হলেও বিলাসের জীবনে তার ভূমিকা বিস্তর বিলাসের জীবনগঙ্গার শেষাবধি তার উপস্থিতি সমগ্র উপন্যাসে এ-চরিত্রটি আচার-আচরণে অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র পুরুষ হয়েও 'পুরুষমানুষের খবর কম জানতে পারে সয়ারাম মেয়েদের খবর তার নখদর্পণে কেন না, ভাল বলো, মন্দ বলো, মেয়েমানুষের মতন, মেয়েমানুষের সঙ্গে তার ওঠাবসা বেশি গাঁয়ের বউ-ঝিয়েরা মন খুলে তার সঙ্গে ঘরের কথা বলে শান্তি পায়।'[৬০] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথার* নসুবালা চরিত্রের সঙ্গে সয়ারামের রয়েছে লক্ষণীয় সাযুজ্য।[৬১]

গঙ্গা উপন্যাসের প্রান্তিক চরিত্রসমূহ গঙ্গানির্ভর জনজীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে নির্মাণ করেছেন সমরেশ বসু প্রত্যেকটি চরিত্র হয়ে উঠেছে মাছমারাদের জীবনানুষঙ্গের নিখাদ বাহন। গঙ্গা এবং তৎপার্শ্ববর্তী মাছমারাদের সাংস্কৃতিক রং ও রূপের পরিচয় যেন প্রত্যেকটি চরিত্রের অবয়বে উৎকীর্ণ। বশীর, রাম মালো, কেদমে পাঁচু, অমর্ত(অমৃত), অনন্ত, অভয়, রসিক, পরান, সুরীন, ব্রজেন ঠাকুর, দুলাল, আতরবালা, ঠাণ্ডারাম, নুরুল, আমানুল, শ্রীদাম– প্রত্যেকটি চরিত্র হয়ে উঠেছে মাছমারাদের আটপৌরে জীবনানুষঙ্গের অবিকল বাহন। আঞ্চলিক জীবন-পরিবেশের গভীর অতলে প্রবেশ ছাড়া জীবনকে এরূপ সাষ্টাঙ্গে সাপটে ধরা অসম্ভব।

গঙ্গা উপন্যাসটি প্রধানত পাঁচুর প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বিন্যস্ত পাঁচুর স্মৃতি ও শ্রুতিজাত অবিরাম ভাবনাস্রোতে আন্দোলিত হয়েছে এ-উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনাবর্ত। অবশ্য ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ প্রেক্ষণবিন্দু থেকে উপস্থাপিত হয়েছে পাঁচুর মৃত্যুপরবর্তী ঘটনাপুঞ্জ। পাঁচুর দৃষ্টিকোণ-উৎসারিত ঘটনাংশ, বিশেষত, অগ্রজ নিবারণ মালোর জীবন ও মৃত্যুস্মৃতি-তাড়িত বর্ণনাংশ এ-উপন্যাসে নির্মাণ করেছে আবেগী পরিপ্রেক্ষিত। গঙ্গাবক্ষে স্ত্রী-কন্যা-পুত্র-পরিজনবিচ্ছিন্ন মাছমারাদের নির্মম জীবনভাবনা উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে আবেগ-সংবেদনাময় গীতাত্মক অনুষঙ্গে; পাঁচুর অন্তর্ভাবনা-সহযোগে :

> এ আষাঢ়ে রাত নেমেছে এখন পুবের ধলতিতা বীরপুরেও। এখানে জাগে মাছমারা এই গঙ্গার বুকে। ঘরে জাগে বউ-ছেলে মেয়ে-মায়েরা। ঘুম কি আছে। পুরুষ নেই ঘরে, বাপ নেই, ছেলে নেই। ঘুম-ঘুম বুক ছ্যাঁত করে ওঠে। কে জানে, কোন অকূলে ভাসছে এখন তারা।
>
> যখন যাবৎ সংসার ঘুমোয়, তখন মাছমারার বউঝিয়েরা জাগে। এইটা নিয়ম। তারা জাগে বারোমাস।...
>
> বউ তার ঘুমন্ত সন্তান বুকে নিয়ে জাগে ঘরে। অন্ধকারে দু চোখ মেলে সেও ভেসে বেড়ায় ঘরের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে। এ বিধির বিধান নয়। বিধি দেয় রাত আর ঘুম। এই ঘরনি জাগে পোড়া প্রাণের বিধানে।[৬২]

উপন্যাসে প্রতীকী-চিত্রকল্পময় অনুষঙ্গ রয়নে সমরেশ বসু প্রদর্শন করেছেন তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব গামলি পাঁচির সঙ্গে বিলাসের লিবিডো-সম্পর্কিত বর্ণনাংশ এতৎপ্রসঙ্গে লক্ষণীয় :

> ...পুরুষ দেখেছে অনেক অমর্তের বউ। এমন দপদপে নাগ দেখেনি। ভয়ে এক পা পেছুল সে।
> বিলাস কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো তার হাত ধরে বলল, পালাচ্ছ কেন, কাঁটার গুণ দেখে যাও। বলে টেনে নিয়ে ফেলল গোয়ালের বিচুলি গাদার অন্ধকারে।...
> রাইমঙ্গলের জোয়ার এসেছে তখন, যত হাজা-মজা ফালি-ফ্যাকড়া নদীর ঝুঁটি নেড়ে, বুক ডুবিয়ে। ইছামতী তার জোয়ারের ঠোঁটে নিয়ে এসেছে চৈত-টোটার বাতাসের শাসানি। নির্জন দুপুরটা বাতাসের মারে উলটিপালটি খেতে লাগল।[১৩]

গামলি পাঁচির সঙ্গে বিলাসের উদ্দাম শরীরী সম্পর্কের চিত্রায়ণে সমরেশ বসু ব্যবহার করেছেন কাঁকড়ার দাঁড়া-কাঁটা, রাইমঙ্গল-ইছামতীর জোয়ার, হাজা-মজা ফালি-ফ্যাকড়া নদীর ঝুঁটি, চৈত-টোটার বাতাসের শাসানি প্রভৃতি উপমানচিত্র। এ-উপমান-অনুষঙ্গ বিলাস-পাঁচির প্রবল যৌনাবেগ, দুরন্ত কামোদ্দীপনা এবং তীব্র শ্বাসরোধী আসঙ্গলিপ্সার প্রতীকী-চিত্রকল্পময় রূপায়ণে সমৃদ্ধ।

বিলাস-হিমির পরস্পরবিচ্ছিন্ন জীবনপরিণামও এ-উপন্যাসের নিম্নোক্ত বর্ণনাংশে নিপুণ শিল্পকৌশলে সংকেতায়িত করেছেন লেখক :

> দেখো, সারা শরীর দুলিয়ে কেমন গলুয়ে উঠে আসছে মেয়ে। মুকড়া জলের টানা ঢল কেমন কলকল করে আসছে।...
> বিলাস বলল, বসো, লৌকো নোঙর করি আগে।
> দুটো মানুষ সামনে পিছনে। ভয় লজ্জা কিছু নেই। কপালের টিপ দিয়ে চিকুর হেনে হিমি বলল গলা নামিয়ে, নোঙর না করলে কী হয় ঢপ ?
> বিলাস হিমির দিকে চোখ তুলে বলল, ভেসে যবে।
> – অকূল পাথারে নাকি ?
> – বিলাস বলল, হ্যাঁ, বড় অকূল। ভাঙার মানুষের প্রাণ কাঁদবে সেই অকূলে।...
> তবু অকূলে যে বড় মন টানে ঢপ ?
> নোঙর করে হেসে বিলাস বলল, টানে ? টানবে বইকী, সবাইকে টানে। আমি তাই যাব।
> আমি সমুদ্রে যাব। এখন নোঙর করেছি তোমার ঘরের তলায়।[১৪]

মুকড়া জলের টানা ঢলের সঙ্গে লাস্যময়ী হিমির তুলনা মাছমারাদের জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে বিস্ময়করভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রয়োগকুশলতায় এটি নিঃসন্দেহে অসামান্য। হিমির দেহগাঙে জীবনতরী নোঙর করবার যে উদ্দীপিত আকাঙ্ক্ষা বিলাসকে অবিরাম প্রলোভিত করেছে, পরিশেষে তা যে হিমি-বিয়োজিত সমুদ্রযাত্রায় পর্যবসিত হবে, তা আগাম সংকেতিত হয়েছে এ-বর্ণনাংশে।

গঙ্গাবক্ষে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার প্রাক্‌পর্যায়ে পশ্চিমের রক্তলাল আকাশ দেখে পাঁচুর যে অস্তিত্বোপলব্ধি, তা অসাধারণ নৈপুণ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে নিম্নোক্ত প্রতীকী-চিত্রকল্পের মাধ্যমে :

> সন্ধ্যা এখনও নামেনি। দিন তবু যায় যায়। পশ্চিম আকাশের কানকো ছিঁড়ে যেন রক্ত পড়ছে। সূর্য হেলে গেছে চোখের আড়ালে। দলা-দলা মেঘ, পুব বাতাসে যায় পশ্চিমে। তাতে দিন শেষের আলো পড়ে মনে হয় যেন, রক্তের টোপানি ঝরছে আকাশের ঢালুতে।[৬৫]

সূর্যাস্তকালে পশ্চিম দিগ্বধূর আঁচল থেকে ঝরে পড়া রক্তিম আভা যেন মাছমারাদের যন্ত্রণাকাতর রক্তমোক্ষণেরই প্রতীকী প্রতিরূপ। উপমান 'কানকো'র মাধ্যমে লেখক মাছমারাদের চিরচেনা বাস্তবকেই করে তুলেছেন ভাষারূপে বাঙ্ময়

গঙ্গা উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমা-অলংকার গঙ্গানির্ভর মাছমারাদের জীবন-জীবিকা, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক আচারক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত পট-পরিবেশ, ঘটনা ও চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদানের জন্য তিনি উপন্যাসে যেসব উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলংকার ব্যবহার করেছেন তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. ...ছাইচাপা আগুনের মতো ধুঁইয়ে উঠছে ব্যথা।[৬৬]
২. ...যেন কোনও বিরাটকায় প্রেত তার আকাশছোঁয়া থাবা দিয়ে ঘরটির ঝুঁটি ধরে দিয়েছে নেড়ে।[৬৭]
৩. থেকে থেকে বাতাসের ডাকটা বাঘওয়ানোর মতো শোনা যাচ্ছে।[৬৮]
৪. খালের ধারে ধারে... বকের মতো তীক্ষ্ণ চোখে বশীর পায়ের চিহ্ন খুঁজল।[৬৯]
৫. কালো কুচকুচে রং, পেটানো শরীর। নেহাইয়ের মতো শক্ত। যেন নিমকঠের কালো রং মাখা চকচকে মূর্তি। ...ভ্রূ কুঁচকে মুখ তুলে তাকালে মনে হয়, কেউটে সাপ যেন ফণা ধরে আছে। ভেড়ার লোমের মতো কালো কোঁচকানো চুল। যেন জাতসাপের ডিম-ফোটা শলুই কিলবিল করছে মাথায়।[৭০]
৬. শীত-আড়ষ্ট গভীর জঙ্গল, দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল জুজুবুড়ির মতো।[৭১]
৭. নড়লে চড়লে মাংসপেশি সারা অঙ্গে কেউটের মতো ওঠে কিলবিলিয়ে।[৭২]
৮. ছই না থাকলে বাঁশের গুঁড়োয় মনে হয়, গোটা নৌকাখানি যেন পেল্লায় একটি জানোয়ার দাঁত বার করে আছে।[৭৩]
৯. যে যাবে লড়াই করতে স্রোত পেছনে ফেলে, বাতাসের আগে, সে হল এই সাপের মতো সরু হিলহিলে বাছাড়ি নৌকা।[৭৪]
১০. গলুই সিঁধোতে পারে জলের মধ্যে নাঙলের ফালের মতো।[৭৫]
১১. ওই যে শ্মশান, দক্ষিণেশ্বরের গাছগাছালি কেমন মাথা নাড়ছে এদিক ওদিক করে। যেন রাত্রিবেলার অবসরে, রাতের জীবেরা সব খেলায় মেতেছে।[৭৬]
১২. ইছামতীর কালো টলটলে জল নোনা। মাছমারার চোখের জলের মতো।[৭৭]
১৩. সে মেয়ে আমার কলসির গলা ভরতি জল। কখন কতটুনি চলকে এদিক ওদিক পড়ে, সে ভয়ে বাঁচি না...[৭৮]
১৪. মুখে তার গোটা জীবনের দাগগুলি কুটো কাঠির মতো দলা পাকিয়ে আছে।[৭৯]
১৫. বক ঘুরছে ইতস্তত। লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলছে, যেন পাড়ার বামুন ঠাকুরুনটি। বড় ছুঁচিবাই, যেন দেখেশুনে পা ফেলছে।[৮০]

১৬. গায়ে জামা নেই। একখানি শাড়ি পরে এসেছে। গাঢ় নীল দক্ষিণের সমুদ্রের মতো।[৮১]

১৭. বিলাস তখন সত্যি গিয়ে বসেছে কাঁড়ারে, একেবারে গঙ্গার পুবমুখো হয়ে। গাব-আঠা-মাখানো কালো কাঁড়ারের উপরে যেন রং-করা দারুমূর্তি। কী কালো। যেন কেউটে বসে আছে ফণা তুলে।[৮২]

১৮. শহরের ফড়েনির চোখ-মুখের ভাবেও যেন সাপ-খেলানো মন্ত্রের উত্তেজনা।[৮৩]

১৯. মেঘ নামছে বাসুকির মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে।[৮৪]

২০. ছোঁড়ার চোখে যেন চড়া পিদিমের শিশ দপদপাচ্ছে।[৮৫]

২১. মাছমারাকেই দর নিয়ে নামতে হয় মুকড়া জলের টানের মতো।[৮৬]

২২. যেমন অন্ধকারে চকচক করে জল, তেমনি কোটরে চকচক করে খুড়োর দুটি চোখের বিন্দু। না, জল নয়, যেন অপলক মীনচক্ষু।[৮৭]

২৩. টকটকে লাল শাড়ি পরেছে একখানি। তাজা ইলিশ-কাটা গাঢ় রক্তের মতো লাল।[৮৮]

উপন্যাসে সমরেশ বসুর ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন উপন্যাস-অন্তর্গত জনজীবনবাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপুর্ণ। যেমন; 'যদি বর্ষে আগনে, রাজা যান মাগনে'; জীবনটা ফুটো কলসি, সে কখনও ভরে না' ইত্যাদি।

মাছমারারা গঙ্গাবক্ষে মাছমারার জন্যে যে সমস্ত জাল ব্যবহার করে, উপন্যাসের বিভিন্ন এলাকায় সে-সবের উল্লেখ রয়েছে। যেমন : সাংলো জাল, বাছাড়ি জাল, টান জাল, পাটা জাল, কাঁড়ারে জাল, টানাছাঁদি জাল, বাঁধাছাঁদি জাল ইত্যাদি। যে-সব মাছের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে : ইলিশ, বাটা, ভাঙন, ভেটকি, ভোলা, খয়রা, রিঠে, রসনা চিংড়ি, শিলিঙ্গে প্রভৃতি।

গঙ্গা উপন্যাসের ভাষিক প্রকরণে সমরেশ বসুর নিরীক্ষার ছাপ সুস্পষ্ট। উপন্যাসের 'বিষয়বস্তুর জন্য, সঠিক অনুপুঙ্খ সংগ্রহের জন্য, মাছমারাদের বাগ্বিধি, পরিভাষা আয়ত্ত করার জন্য সমরেশ দীর্ঘসময় ধরে সমস্ত শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে জলে নৌকায় ঘুরেছেন।'[৮৯] বিশেষত, আতপুরে বসবাসকালে লেখক গঙ্গাতীরবর্তী মাছমারাদের নিজস্ব বাক্-ভঙ্গি রপ্ত করেছেন, এবং তা উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে। উপন্যাসের বিষয়াংশের সঙ্গে ভাষার সাযুজ্য তাই অতিনিবিড়। মাছমারাদের নিয়ত-উচ্চারিত শব্দানুষঙ্গ উপন্যাসে অসামান্য ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত। মাছমারাদের আটপৌরে জীবনবৃত্তে ব্যবহৃত পরিভাষা আমাদের অনাত্মীয় শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রথম-প্রথম 'পাসওয়ার্ডে'র মতো ঠেকলেও উপন্যাস যতই অগ্রসর হয়েছে, ততই সেসব শব্দের বোধগম্যতা হয়ে উঠেছে স্পষ্ট। এর ফলে মাছমারাদের জীবনবাস্তবতার বর্ণনা অর্জন করেছে আমূল বিশ্বস্ততা। চলন্তা গঙ্গার বহমানতার সঙ্গে এ-ভাষার সাযুজ্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মাছমারাদের জীবনের সঙ্গে এর যোগ আন্তরিক। মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্তে পাঁচুর উচ্চারিত কথামালায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে এ–ভাষার রসব্যঞ্জনাময় আবেগ ও প্রাণনশক্তি :

> ...বোঠান, পেথম পোহরের শ্যাল ডাকছে এখন ধলতিতেয়, শুনতে পাচ্ছি গো। হুতোম প্যাঁচাটা ডেকে মরছে কেন, ঠাহর করতে পারছ না ? কেন অমন দমকা

> দমকা বাতাস আছড়ে আছড়ে পড়ছে বেড়ায়, অনুমান করতে পারছ না ? কেন তোমার জায়ের হাত থেকে বটিখানি পড়ে গেল, তাই ভেবে মরছ ? ওই জানান দিচ্ছে। পাঁচু তোমাদের ছেড়ে যায়। বিলেস... বা-বা বি-লে-স...[৯০]

রসে-কষে, কবিত্বে-লালিত্যে আর আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গির উত্তাপে এ-ভাষা স্পন্দিত ও জীবন্ত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথার* মতোই মাছমারাদের জীবনান্তর্গত শব্দাবলি তিনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধরনে উপস্থাপন করেছেন এ-উপন্যাসে। নাগরিক মধ্যবিত্তের অপরিচিত শব্দগুলোকে প্রায়ই তিনি ব্যবহার করেছেন টীকাভাষ্যসহ উপস্থাপিত শব্দসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : দখনে বাওড় (সমুদ্রের ঝড়), এক গোনে (এক জোয়ারে), টোটা (মন্বন্তর), ফোড়ন (ছোট খাল), আগনা (জেয়ারের আগমন), শাবর (সাইয়ের নৌকা-জমায়েত), চুকম (ফাঁকা জায়গা), তিবড়ি (নৌকার তোলা উনুন), ছোল (জালের সঙ্গে ভাসমান বাঁশ), সাই (সমুদ্রযাত্রা), সাংলো (ইলিশ মাছের হাত-জাল), চলকা (নৌকোয় ছিটকে-ওঠা জল), হাবর (বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি নোনা মাছের সংকীর্ণ বিচরণক্ষেত্র), চলন্তা/মুকড়া (জোয়ারের পর ভাটার টান), বলাগড়ের নৌকা (বলাগড় কারখানায় তৈরি নৌকা), জলেঙ্গা জল (পাহাড় থেকে লাল জলের পর-পর ভেসে-আসা মাটো রঙের জল), ওড় (ইটখোলার গর্ত), ওকোড় মারা (কাছির টান), গড়ান মারা (সাংলো ফেলে পাথালি নৌকা ভেসে যাওয়া), বেলিয়ে যাওয়া (গহিন জলের জাল বালিচাপা পড়া) ইত্যাদি।

গঙ্গা উপন্যাসে মূলত গঙ্গানির্ভর মানুষের জীবনচিত্রাঙ্কন সমরেশ বসুর অন্বিষ্ট হলেও কখনো কখনো ঔপন্যাসিক চরিত্র-পাত্রের রোমান্টিক ভাববিলাসের চিত্রাঙ্কনে হয়ে উঠেছেন অত্যুৎসাহী। এর ফলে উপন্যাসের শিল্পসংহতি যে আদৌ ব্যাহত হয়নি তা নয়। 'বিশেষত উপন্যাসের শেষদিকে এসে হিমি-বিলাস সম্পর্কিত প্রেমকাহিনী উপন্যাসের বলিষ্ঠ উপসংহার-সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে। *গঙ্গা* শেষ পর্যন্ত আমাদের সমুদ্রে পৌঁছে দিতে পারেনি।'[৯১] হিমি-বিলাস উপাখ্যানটি হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত নরনারীর রোমান্টিক প্রেমবিলাসের অপচ্ছায়ামাত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝির* কুবের-কপিলার মতোই সমরেশ বসুর *গঙ্গা* উপন্যাসে বিলাস-হিমির উপস্থিতি। দুই প্রণয়-সম্পর্কের পরিণতি-চিত্র সমধর্মী না হলেও এবং এদের মানস-ভূগোলের গতিচিত্র বিভিন্ন হলেও দুটো উপন্যাসের রস-প্রতিপত্তি যে এদের উপস্থিতিতে ব্যাহত হয়েছে একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য। বিশেষত *গঙ্গা* উপন্যাসের পরিণামীচিত্র এ সত্য স্পষ্ট করে যে, বিলাসের জীবনে হিমির উপস্থিতি কাহিনীর অনিবার্য পরম্পরাপ্রসূত নয়। তবু গঙ্গা এবং গঙ্গাতীরবর্তী জনাঞ্চলের জীবনচিত্রাঙ্কনে তিনি যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর উৎকীর্ণ করেছেন তা অসামান্য। মাছমারাদের জীবনসত্যের নিপুণ উপস্থাপনায় সমরেশ বসু এ-উপন্যাসে উদযাপন করেছেন দক্ষ জীবনশিল্পীর আনন্দ।

তথ্যপঞ্জি

১ *গঙ্গা* প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। এটি সমরেশের 'সবচিন' উপন্যাস। ১৯৫৭ সালে 'জন্মভূমি'(?) পূজা সংখ্যায় গঙ্গা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রবীণ নবীন কলের অভিনন্দন ধন্য হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : গ্রন্থপরিচিতি, *সমরেশ বসু রচনাবলী*, সম্পাদনা : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৮৭৭)

২ সমরেশ বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবকুমার বসু লিখেছেন : 'আমাদের পরিবারের ছয়টি প্রাণীর তখন আতপুরের তরফদার পাড়ায় বাস' (দ্রষ্টব্য : বাবাকে নিয়ে, সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা, *দেশ*, সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৬৯)

৩ গঙ্গা নদীর পরিচয় সম্পর্কিত তিনটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাংশ নিম্নরূপ :

ক. 'এটি (গঙ্গা) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদীপ্রণালীসমূহের মধ্যে অন্যতম। সমগ্র ভারতবর্ষ এবং যে সকল স্থানে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটেছিল সে সব অঞ্চলে গঙ্গা নামটি সুপরিচিত। এর নিষ্কাশন অববাহিকা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের একটি এবং এ অঞ্চলেই ইন্দো-আর্য সভ্যতা বহু শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়েছে।...
তিব্বত-ভারতের সীমান্তের সন্নিকটে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে।...গঙ্গার মূল উৎস হিমালয় পর্বতমালার প্রায় ৩,৯০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত গঙ্গোত্রী হিমবাহ। গঙ্গোত্রী তীর্থস্থানটি গোমুখ থেকে কয়েক কিলোমিটার ভাটিতে।... নদীটি দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে ভারতভূমিকে অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে নবাবগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। দেশের অভ্যন্তরেও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে এটি গোয়ালন্দ ঘাটের কাছে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়ে আরও ভাটিতে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।... বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা নদীর সমগ্র প্রবাহপথই 'পদ্মা' নামে বহুল পরিচিত,... যমুনা সঙ্গম পর্যন্ত গঙ্গার সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২৬০০ কিমি এবং এর নিষ্কাশন অঞ্চলের আয়তন ১০,৮৭,৪০০ বর্গ কিমি যার মাত্র ৪৬৩০০ বর্গ কিমি এলাকা বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত.... কয়েক শতাব্দী পূর্বে বঙ্গ সমূভূমিতে গঙ্গার প্রধান নদীখাত ছিল হুগলি।' (দ্রষ্টব্য : *বাংলা পিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড-৩, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৩ , প্রধান সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১১১-১১২)

খ. 'প্রাচীন গৌড়ের প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার প্রবাহ দু-ভাগে ভাগ হয়েছে। দক্ষিণ-বাহিনী প্রবাহের নাম ভাগীরথী। সমুদ্রের কাছাকাছি ভাগীরথীই হুগলি নামে অভিহিত। আজকাল গঙ্গার প্রধান ধারা অপর প্রবাহ পদ্মা দিয়ে প্রবাহিত। এক সময় কিন্তু তা ছিল না। ভাগীরথীই ছিল গঙ্গার প্রধান প্রবাহ পথ।' (দ্রষ্টব্য : অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালি*, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৫, সাহিত্যিকা, ঢাকা, পৃ. ২৬)

গ. 'ত্রিবেণী-হুগলী থেকে শুরু করে সোজা একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত যে প্রবাহকে সাধারণভাবে এখন বলা হয় হুগলী নদী, রাজমহলের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার পর ফরাক্কা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত যে প্রবাহকে আমরা বলি গঙ্গা, লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর লিপিতে (আনুমানিক, ১১৭৫ খ্রী) বেতড্ড চতুরকের (হাওড়া জেলার বেতড় গ্রাম) পাশ দিয়ে

দক্ষিণমুখী যে প্রবাহটিকে বলা হয়েছে জাহ্নবী, মৎস্যপুরাণোক্ত যে প্রবাহটি বিন্ধ্যশৈল গাত্রে প্রতিহত হয়ে, ব্রহ্মোত্তর (উত্তর গাঢ়) দেশ ভেদ করে, (পূর্ব) বঙ্গ ও (পশ্চিম) তাম্রলিপ্ত (সুহ্মদেশের অন্তর্গত) স্পর্শ করে প্রবেশ করেছে গিয়ে সমুদ্রে এবং যে গঙ্গা প্রবাহটিকে বলা হয়েছে ভাগীরথী, সেই গঙ্গা-ভাগীরথী প্রবাহই এই নদীর প্রাচীনতম ও প্রধানতম প্রবাহ। (দ্রষ্টব্য : নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১২৫)

৪ '... এক গভীর জিজ্ঞাসা আমাকে থমকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, মানুষ কি নিরন্তর তার জীবনকে (বেঁচে থাকাকে) এক সুদূর অনিশ্চয়তার মধ্যে শিকার করে ফিরছে ? এই জিজ্ঞাসা জেগেছিল, গঙ্গার বুকে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মাছ মারতে গিয়ে। মাছ 'ধরা' কথাটা তখনই অসত্য মনে হয়েছিল এবং মৎস্যজীবীদের আমি অভিহিত করেছিলাম নির্দয় অসহায় সেই শিকারী জীবন, যার সার্থকতা কেউ বা কোনো নীতি তাদের হাতে তুলে দিতে পারে না, তাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস আর নিরন্তর চেষ্টা ব্যতিরেকে।' (দ্রষ্টব্য : সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে, সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা, *দেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)

৫ "*উত্তরঙ্গ*' উপন্যাসেই প্রথম জন্ম নিয়েছিল আমার স্বাদেশিকতা বোধ। তখন প্রথম চিঠি দিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কবি বিষ্ণু দে। তাঁর দুটি কথা আমি এখনো মনে রেখেছি। এক : আপনার উপন্যাসটি পড়ে মনে হলো, বরীন্দ্র সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে আপনার পরিচয় অতি ক্ষীণ।' দুই : 'আরো লিখুন, গঙ্গার ধারের যে কথা আপনি লিখেছেন, আপনাকে দেখতে চাই তার সাগর সঙ্গমে।' (দ্রষ্টব্য : সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে, সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭)

৬ দ্রষ্টব্য : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু : অর্জিত অভিজ্ঞান (পরিচ্ছেদ : পাঁচ), *সমরেশ বসু রচনাবলী*, সম্পাদনা : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,

৭ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৩৮০, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৭৭০

৮ *সমরেশ বসু রচনাবলী* , প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৫; বর্তমান অভিসন্দর্ভে গঙ্গা উপন্যাসের পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

২০ প্রাগুক্ত

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

২২ নৌকাটি বেশি বড়ো নয়। পিছনের সামান্য একটু ছাউনি আছে। বর্ষা-বাদলে দু তিন জনে কোনোরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে। বাকি সবটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে। এই ফাঁক দিয়া নৌকার খোলের মধ্যে মাছ ধরিয়া জমা করা হয়। জাল ফেলিবার ব্যবস্থা পাশের দিকে। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমে বিপুল পাখার মতো জালটি নৌকার পাশে লাগানো আছে। জালের শেষ সীমার বাঁশটি নৌকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে সমান্তরাল। তার দুই প্রান্ত হইতে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকার ধারে আসিয়া মিশিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নৌকার ভিতরে হাত দুই আগাইয়া আসিয়াছে। জালের এ দুটি হাতল। এই হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো হয়।
গভীর জলে বিরাট ঠোঁটের মতো দুটি বাঁশে বাঁধা জাল লাগে। দড়ি ধরিয়া বাঁশের ঠোঁট হাঁ-করা জাল নামাইয়া দেওয়া হয়। মাছ পড়িলে খবর আসে জেলের হাতের দড়ি বাহিয়া, দড়ির দ্বারাই জলের নীচে জালের মুখ বন্ধ করা হয়। (দ্রষ্টব্য : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংশোধিত মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ. ১৩)

২৩ *সমরেশ বসু রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-৩০১

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭-৩১৮

৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০-৩২১

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

৩৯ দ্রষ্টব্য: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু : অর্জিত অভিজ্ঞান (পরিচ্ছেদ : পাঁচ), *সমরেশ বসু রচনাবলী*, প্রাগুক্ত

৪০ 'হঠাৎ ওই বাবার থান থেকে বেরিয়ে এলেন কত্তা... এই ন্যাড়া মাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্দাক্ষি, এই পৈতে, পরনে লাল কাপড়, পায়ে খড়ম– কত্তা জলের ওপর দিয়ে খড়ম পায়ে এগিয়ে এসে বললেন– কোথা যাবে সায়েব ?' দ্রষ্টব্য: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, প্রথম অবসর প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৮

৪১ *সমরেশ বসু রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-৩০১

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৪৯ প্রাগুক্ত

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৫২ প্রাগুক্ত

৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

৫৪ 'চার-পাঁচ মণের তালগাছের গুঁড়ি একদিকে ধরে তুলে, টেনে যে সবচেয়ে বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারবে, তাকে সবাই সম্মান দেয়, বাছাড় বলে।' *(সমরেশ বসু রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪)

৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬-২৪৭

৫৭ 'এক পাড়াতেই সাতটা মেয়ের নাম পাঁচি। একটাকে ডাকলে সাতটা সাড়া দেয়। এই তেঁতলে বিলেসের মতো। পাড়ায় বিলেস আছে তিনটি। তেঁতুলতলার বিলেস, তেঁতলে। তেমনি গাম্বিলতলার পাঁচি, গামলি পাঁচি। আসলে গামলিটা গাম্বলি।'
দ্রষ্টব্য : *সমরেশ বসু রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৩

৫৮ *সমরেশ বসু রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১–৫২

৫৯ (ক) 'হিমি-বিলাস উপাখ্যানটি কাহিনীর অনিবার্য পরম্পরা প্রসূত নয়। প্রায় মধ্যবিত্ত রোমান্সের প্রেমবিলেসে স্খলিত হয়েছে।' (দ্রষ্টব্য : আনন্দ বাগচী, সমরেশ: আদর্শ বনাম খসড়া, সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা, *দেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০)
(খ) 'হিমি বইখানির সর্বাপেক্ষা দুর্বলতম অংশ। তার ভালোবাসায় মধ্যবিত্ত নায়িকার ধাঁচ এসে পড়ায় বিলাসে সমুদ্রযাত্রার ফলশ্রুতি সৃজিত হয়নি।' (দ্রষ্টব্য : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দেজ পাবলিশিং কলকাতা, জুন ১৯৮০, পৃ. ৩৫২)

৬০ *সমরেশ বসু রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৩

৬১ 'নসুবালা করালীর পিসতুতো ভাই। আসল নাম নসুরাম। অদ্ভুত চরিত্র নসুরামের। ভাবে ভঙ্গিতে কথায় বার্তায় একেবারে মেয়েদের মত। মাথায় মেয়েদের মত চুল, তাতে সে খোঁপা বাঁধে, নাকে নাকছাবি পরে, কানে মাকড়ি পরে, হাতে পরে কাচের চুড়ি আর রুলি, মেয়েদের মত শাড়ি পরে। মেয়েদের সঙ্গে গোবর কুড়ায়, কাঠ ভাঙে, ঘর নিকায়, চন্ননপুরে দুধের যোগান দিতে যায়, মজুরনী খাটতে যায়।...মেয়েদের সঙ্গেই সে ব্রতপার্বণ করে।...' (দ্রষ্টব্য : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)

৬২ *সমরেশ বসু রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

৭৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

৮০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

৮১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

৮২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

৮৯ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু : অর্জিত অভিজ্ঞান (পরিচ্ছেদ : পাঁচ), *সমরেশ বসু রচনাবলী*, প্রাগুক্ত

৯০ সমরেশ বসু রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

৯১ আনন্দ বাগচী, সমরেশ : আদরা বনাম খসড়া, সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা, *দেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০